বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

দাখিল

অষ্টম শ্রেণি

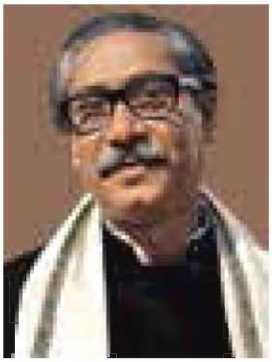

World Health Organization

UNESCO

unicef

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে দাখিল অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

দাখিল

অষ্টম শ্রেণি

রচনায়

প্রফেসর মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী
অধ্যাপক ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন
অধ্যাপক ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ
অধ্যাপক ড. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন
ড. সেলিনা আখতার
ফাহ্‌মিদা হক
ড. উত্তম কুমার দাশ
আনোয়ারুল হক
সৈয়দা সঙ্গীতা ইমাম

সম্পাদনায়

অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন
অধ্যাপক শফিউল আলম
আবুল মোমেন
অধ্যাপক ড. মাহবুব সাদিক
অধ্যাপক ড. মোরশেদ শফিউল হাসান
অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক
সৈয়দ মাহফুজ আলী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১১
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪
পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৯

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক । পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শীর্ষক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সামাজিকবিজ্ঞান, ইতিহাস, পৌরনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল ও জনসংখ্যার বিষয়গুলো স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপনের পরিবর্তে সমন্বিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থী বাংলাদেশের সমাজ ও পরিবেশ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা এবং বৈশ্বিক বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবে। আশা করা যায়,এসব বিষয়বস্তু অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যে লালিত মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিকে পরিণত হবে। নিজেকে সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ পাবে। বৈশ্বিক বিষয়াবলির সাথে তুলনা করে নিজের জানার জগতকে সমৃদ্ধ করতে পারবে। সমাজের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলায় প্রত্যাশিত জীবন দক্ষতার অধিকারী হয়ে উঠবে।

২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক স্তরে প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তক মাদ্রাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপযোগী করে দাখিল স্তরের পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রবর্তন করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	ঔপনিবেশিক যুগ ও বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম	১–১২
দ্বিতীয়	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ	১৩–৩৩
তৃতীয়	বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন	৩৪–৪৫
চতুর্থ	ঔপনিবেশিক যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য	৪৬–৫১
পঞ্চম	সামাজিকীকরণ ও উন্নয়ন	৫২–৬০
ষষ্ঠ	বাংলাদেশের অর্থনীতি	৬১–৭০
সপ্তম	বাংলাদেশ : রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা	৭১–৮৪
অষ্টম	বাংলাদেশের দুর্যোগ	৮৫–১০১
নবম	বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও উন্নয়ন	১০২–১০৬
দশম	বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা	১০৭–১১৩
একাদশ	বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী	১১৪–১২৬
দ্বাদশ	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ	১২৭–১৩৬
ত্রয়োদশ	বাংলাদেশ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগী সংস্থা	১৩৭–১৪৩
চতুর্দশ	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)	১৪৪–১৫২

প্রথম অধ্যায়

ঔপনিবেশিক যুগ ও বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম

বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের আগমন ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে হলেও পরে তারা আমাদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নেয়। এদের মধ্যে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যায়। ১৭৫৭ সালে বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে এক সময় তারা ক্ষমতা দখল করে নেয়। বাংলায় ইংরেজদের শাসন চলে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। এভাবে ১৭৫৭ সালের পরে বাংলায় যে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় সাধারণত আমরা তাকে ঔপনিবেশিক শাসন বলি। আর ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ইংরেজ শাসনামলকে ঔপনিবেশিক যুগ বলি।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- উপনিবেশ কী তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার বিস্তার ও অবসানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলায় ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের আগমন ও বাণিজ্য বিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলায় ইংরেজ শাসনের কার্যক্রম ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করতে পারব;
- ইংরেজ কোম্পানি শাসনের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ইংরেজ কোম্পানি শাসনকালে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করতে পারব;
- ইংরেজ কোম্পানি শাসনের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ব্রিটিশ শাসনের বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- তৎকালীন বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করতে পারব;
- ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারব;
- বাংলার জাগরণের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ- ১ : বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন ও ঔপনিবেশিক শাসনের পটভূমি

বিদেশি কর্তৃক কোনো দেশ দখল করে শাসন প্রতিষ্ঠা করলেই তাকে ঔপনিবেশিক শাসন বলা হয় না। ঔপনিবেশিক শাসনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দখলদার শক্তি চিরস্থায়ীভাবে শাসন প্রতিষ্ঠা করতে আসে না। তারা জানে একদিন এই শাসনের পাট উঠিয়ে তাদের ফিরে যেতে হবে নিজ দেশে। তবে দখলদার শক্তি যতদিন শাসক হিসাবে থাকবে ততদিন সেই দেশের ধন-সম্পদ নিজদেশে পাচার করবে। তারপর যখন তাদের শাসনের বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে বা অন্য কোনো কারণে অন্যের দেশ শাসন করা আর লাভজনক মনে হবে না তখন ফিরে যাবে নিজ দেশে। এভাবে অন্য কোনো দেশের উপর দখলদারদের আধিপত্যই হচ্ছে উপনিবেশ স্থাপন। আর উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করা এই শাসনকে বলা হয় ঔপনিবেশিক শাসন।

প্রথমে বাংলা এবং পরে ভারত উপমহাদেশে ইংরেজরা যে শাসন প্রতিষ্ঠা করে তার বৈশিষ্ট্য উপরে উল্লিখিত ধারণার সাথে মিলে যায়। এ কারণে বাংলা ও ভারতে প্রতিষ্ঠিত ইংরেজ শাসনকে বলা হয় ঔপনিবেশিক শাসন।

ইংরেজ আগমনের অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশে বহিরাগত শক্তি প্রবেশ করেছিল। সকলের আকর্ষণের মূল লক্ষ্য ছিল বাংলার ধনসম্পদ। খ্রিষ্টপূর্ব যুগে বহিরাগত আর্যরা বাংলায় প্রবেশ করেছিল। কিন্তু আর্যরা এখানে কোনো শাসন প্রতিষ্ঠা করে নি। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে বাংলার উত্তরাংশ দখল করেন ভারতের মৌর্য সম্রাট অশোক। সে সময় পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি উত্তরবাংলা হয় মৌর্যদের প্রদেশ। মৌর্যদের পর ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয় গুপ্ত সাম্রাজ্য। চার শতকে উত্তর বাংলা ও দক্ষিণ-পূর্ব-বাংলার কিছু অংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধিকারে আসে। গুপ্তদের পতনের পর সপ্তম শতকে উত্তর বাংলায় প্রথম বাঙালি শাসক শশাঙ্ক কর্তৃক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে শশাঙ্কের রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। তার মৃত্যুর পর একশো বছর ধরে বাংলায় অরাজকতা চলতে থাকে। যাকে সংস্কৃত ভাষায় বলা হয় মাৎস্যন্যায় যুগ। এরপর বাঙালিদের দীর্ঘস্থায়ী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় আট শতকের মাঝ পর্বে। প্রায় চারশো বছর বাংলাকে শাসন করেন বাঙালি পাল রাজারা। পালদের পতনের পর এগারো শতকের শেষ দিকে আবার বিদেশি শাসনের অধীনে চলে যায় বাংলা। দক্ষিণ ভারতের কর্নাটক থেকে আসা সেন রাজারা বাংলার সিংহাসন দখল করে নেন।

সেনদের শাসনের অবসান ঘটে বহিরাগত মুসলমান শক্তির হাতে। তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি রাজা লক্ষণসেনকে পরাজিত করে বাংলার এক ছোট্ট অংশ দখল করেন। ১২০৪ থেকে ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার পশ্চিমে নদীয়া ও উত্তর বাংলার কিছুটা অংশ বখতিয়ার খলজির দখলে ছিল। নদীয়া ও উত্তর বাংলায় তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও পূর্ববাংলা আরও অনেক সময় পর্যন্ত সেন শাসকদের অধীনে ছিল। তবে বখতিয়ার খলজির মাধ্যমে বাংলায় তুর্কি সুলতানদের শাসনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। ১২০৬ সালে বখতিয়ার খলজির মৃত্যুর পর থেকে ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত বাংলা জুড়ে মুসলিম শাসনের বিস্তার ঘটতে থাকে। এ সময়ের মধ্যে বাংলার তিনটি অংশে দিল্লির মুসলিম সুলতানদের তিনটি প্রদেশ বা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভাগগুলোকে ফারসি ভাষায় 'ইকলিম' বলা হতো। এই ইকলিমগুলো উত্তর বাংলায় লখনৌতি, পশ্চিম বাংলায় সাতগাঁও এবং পূর্ব বাংলায় সোনারগাঁও নামে পরিচিত ছিল। ১৩৩৮ সালে সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ দিল্লির মুসলমান সুলতানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলায় দুইশো বছরের স্বাধীন সুলতানি যুগ পর্ব। ১৫৩৮ সালে অবসান ঘটে বাংলার স্বাধীন সুলতানি শাসনের। সুলতানগণ বহিরাগত অবাঙালি শাসক হলেও এদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং কেউ নিজ দেশে ফিরে যান নি। অবশ্য এর আগেই বিদেশি মোগলরা দিল্লি দখল করেছিল। মোগল সম্রাট হুমায়ুন ১৫৩৮ সালে উত্তরবাংলার গৌড় অর্থাৎ

ইকলিম লখনৌতি দখল করলেও বাংলায় তখন মোগল শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। এর কারণ বিহারের আফগান শাসক শের খান হুমায়ুনকে প্রথমে বাংলা ও পরে ভারত থেকে বিতাড়িত করেন। এ পর্বে অবাঙালি আফগানদের হাতে চলে যায় বাংলার সিংহাসন।

ভারতে মোগলরা আবার সংগঠিত হয় এবং দিল্লির সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। এরপর সম্রাট আকবরের সময় ১৫৭৬ সালে পশ্চিম বাংলা ও উত্তর বাংলার অনেকটা অংশ মোগলদের অধিকারে আসে। পূর্ববাংলা অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশ অংশ সহজে মোগলরা দখল করতে পারে নি। বারোভূঁইয়া নামে পরিচিত পূর্ববাংলার জমিদাররা একযোগে মোগল আক্রমণ প্রতিহত করেন। আকবরের সেনাপতি মানসিংহ কয়েকবার চেষ্টা করেও বারোভুঁইয়াদের নেতা ঈশা খাঁকে পরাজিত করতে পারেন নি। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ১৬১০ সালে মোগল সুবেদার ইসলাম খান চিশতি চূড়ান্তভাবে বারোভূঁইয়াদের পরাজিত করে ঢাকা অধিকার করেন এবং তৎকালীন দিল্লির সম্রাট জাহাঙ্গীরের নাম অনুসারে জাহাঙ্গীরনগর নামকরণ করেন। এভাবেই বাংলায় মোগল অধিকার সম্পন্ন হয়। এই বিদেশি মোগল শাসন চলে আঠারো শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে মোগল শাসনের চূড়ান্ত অবসান ঘটে। সেই সাথে বাংলার ক্ষমতা দখল করে আরেক বিদেশি শক্তি। এভাবে শুরু হয় ইউরোপীয় শক্তির শাসন।

কাজ-১ : ঔপনিবেশিক যুগ কাকে বলে? ব্যাখ্যা কর।

কাজ-২ : খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে ঔপনিবেশিক যুগ পর্যন্ত বাংলার শাসকদের পর্যায় ক্রমিক তালিকা তৈরি কর।

পাঠ- ২ : বাংলায় ইউরোপীয়দের বাণিজ্য বিস্তার

ইউরোপের কোনো কোনো দেশে খনিজ সম্পদের আবিষ্কার, সমুদ্রপথে বাণিজ্যের বিস্তার এবং কারিগরি ও বাণিজ্যিক বিকাশের ফলে অর্থনীতি তেজি হয়ে উঠেছিল। এর ফলে চতুর্দশ শতক থেকে ইউরোপে যুগান্তকারী বাণিজ্য-বিপ্লবের সূচনা হয়। তখন একদিকে তাদের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শক্তিশালী হতে শুরু করে। অন্যদিকে কাঁচামাল ও উৎপাদিত সামগ্রীর জন্যে বাজারের সন্ধানও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে।

১৪৯৮ সালে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছে ভারতবর্ষকে বিশ্ব-বাণিজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতায় নিয়ে আসেন। আর দক্ষ নাবিক আল বুকার্ক ভারত মহাসাগরের কর্তৃত্ব অধিকার করে এক কথায় পুরো ভারতের বহির্বাণিজ্য করায়ত্ত করে নেন।

১৬৪৮ সালে ইউরোপের যুদ্ধরত বিভিন্ন দেশের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি হয়। একে বলে 'ওয়েস্টফালিয়ার চুক্তি'। এটি সম্পাদিত হওয়ার পর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতি

২০২০

নতুন উদ্যমে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। এদের অধিকাংশের লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষ। আবার তার মধ্যে বাংলার সিল্ক ও অন্যান্য মিহি কাপড় এবং মসলা তাদের প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠে। এতে বহুকাল পর বাংলার বাণিজ্যখাতে বেশ রমরমা ভাব দেখা দেয়। ১৬৮০-১৬৮৩ এই চার বছরে শুধু বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে রপ্তানি আয় দাঁড়ায় দুই লক্ষ পাউন্ড বা তৎকালীন হিসাবে আঠারো লক্ষ টাকা।

পুঁজির শক্তিশালী প্রভাব আর উন্নত কারিগরি জ্ঞানের সমন্বয় করে ক্রমে বিদেশি বণিকরা এদেশে স্থানীয় শ্রমিকদের খাটিয়ে বড় বড় শিল্পকারখানা স্থাপন করে প্রচুর মুনাফা করতে থাকে। ক্রমে ব্যবসার ক্ষেত্রে পর্তুগিজদের চেয়ে ইংরেজদের ভূমিকা প্রাধান্য পায়। এছাড়া ফরাসি, ওলন্দাজ ও দিনেমাররাও বাংলায় কারখানা স্থাপন করে ব্যবসা শুরু করে। এই বিদেশি বণিকদের বিনিয়োগ ও ব্যবসা কেমন ছিল তার কিছুটা হদিস মিলে বিদেশি পর্যটকদেরই বর্ণনায়। ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ের ১৬৬৬ সালে লিখেছেন, 'ওলন্দাজরা তাদের কাশিমবাজারের সিল্ক ফ্যাক্টরিতে কখনো কখনো ৭ থেকে ৮ শ লোক নিয়োগ করত'। ইংরেজ ও অন্যান্য জাতির বণিকরাও এরকম কারখানা চালাত। বার্নিয়ের আরও লিখেছেন, 'শুধুমাত্র কাশিমবাজারে বছরে ২২ হাজার বেল সিল্ক উৎপাদিত হতো।'

এভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে ইউরোপের বণিকরা দেখল বাংলায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেই সবচেয়ে বেশি ফায়দা উসুল করা সম্ভব। এ সময় কলকাতা, চন্দননগর, চুঁচুড়া, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানে ইউরোপীয় বাণিজ্যকেন্দ্রগুলো ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে। আর এদের মাধ্যমে বাংলা থেকে পুঁজিও পাচার হতে থাকে। পলাশি যুদ্ধের আগে এবং মীর জাফর ও মীর কাশিমের আমলে বাংলার প্রচুর সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার হয়ে যায়। এ সম্পদের প্রাচুর্যের কথা স্বয়ং ক্লাইভ ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে সবিস্ময়ে উল্লেখ করেছিলেন।

১৬৮২ সালে ইংরেজ কোম্পানিগুলোর গভর্নর হিসাবে উইলিয়াম হেজেজ হুগলিতে আসেন। এ সময় বাংলায় মোগল কর্মচারীদের অনেকে রাজস্ব সংক্রান্ত দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে, ফলে ইংরেজদের ব্যবসায়ের ক্ষতি হয়। এই অবস্থায় হেজেজ ইংলান্ডের রাজা দ্বিতীয় জেমসকে বিষয়টি বুঝিয়ে ১৬৮৬ সালে স্বদেশ থেকে সৈন্য এনে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। ১৬৮৭ থেকে ১৬৯০ পর্যন্ত ইংরেজদের সাথে মোগল শক্তির বেশ কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধ হয় এবং শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা জয়ী হয়ে তাদের ব্যবসায়িক সুবিধা আদায় করে এক ঢিলে দুই পাখি মারে। তারা এখানে তাদের কুঠি ও কারখানা তৈরির এবং সৈন্য রেখে ব্যবসার অধিকার পায়। একই সংগে প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য ইউরোপীয় শক্তির উপর প্রাধান্য লাভ করে।

কাজ-১ : ভারতবর্ষে যে সকল ইউরোপীয় শক্তির আগমন হয় তার তালিকা তৈরি কর।

কাজ-২ : উইলিয়াম হেজেজ কীভাবে ইংরেজদের ব্যবসায়িক সুবিধা আদায় করেন?

পাঠ- ৩ : বাংলায় ঔপনিবেশিক শক্তির বিজয়ের কারণ

নবাব আলিবর্দি খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রিয় নাতি সিরাজউদ্দৌলা মাত্র ২২ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন। এই সময় তাঁর সামনে একদিকে উদীয়মান ইংরেজ শক্তি ও হামলাকারী বর্গিদের সামলানোর কঠিন কাজ, পাশাপাশি বড় খালা ঘসেটি বেগম ও সিপাহসালার মীর জাফর আলী খানের মতো ঘনিষ্ঠজনদের ষড়যন্ত্র মোকাবিলার কাজ। সিরাজের বিরুদ্ধে তৃতীয় আরেকটি পক্ষও (বণিক শ্রেণি) সক্রিয় ছিল। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তার ঘটার সাথে সাথে বড় ব্যবসাকেন্দ্রগুলোতে ক্ষমতালোভী ভারতীয় বণিকসমাজের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলায় রাজপুতনা থেকে আগত মারওয়াড়িরা এই ক্ষমতাবান বণিক। তারাও ব্যবসায়িক স্বার্থে ইংরেজ বণিকদের পক্ষে যোগ দেয় এবং বাংলার নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এরই ফল হলো পলাশির যুদ্ধে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবের পরাজয় ও নির্মম মৃত্যু এবং ইংরেজদের হাতে বাংলার পতন। এভাবে শুরু হলো বাংলার ইতিহাসে প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসনের কাল। এবার আমরা একটু পিছন ফিরে বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসনের কারণগুলো আরেকবার স্মরণ করি–

১. দুইশো বছরের স্বাধীন সুলতানি আমল ছাড়া বহিরাগত শাসকদের সময়ে বাংলার সাধারণ মানুষ চরম অর্থনৈতিক শোষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। তারা শাসকদের প্রতি বিমুখ ও উদাসীন ছিল। ফলে ইংরেজ আক্রমণে নবাবের পতন বা স্বাধীনতার অবসান সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা বা আগ্রহ ছিল না।

২. দীর্ঘকাল ধরে পুঁজি পাচারের ফলে বাংলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্থবিরতা এতই প্রকট ও গভীর ছিল যে বাণিজ্য বিস্তারের ফলে সৃষ্ট নতুন সুযোগ কাজে লাগানোর মতো উদ্দীপনা তাদের মধ্যে ছিল না।

৩. উদীয়মান অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি হিসাবে ইংরেজদের উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অন্যদিকে তাদের ধূর্ত পরিকল্পনা বোঝার মতো কোনো রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তি দেশে ছিল না।

৪. বাংলার শাসকদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও চক্রান্ত এত গভীর ছিল যে তরুণ অনভিজ্ঞ নবাবের পক্ষে তা মোকাবিলা করা সম্ভব হয় নি।

কাজ-১ : বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার কারণ বর্ণনা কর।

২০২০

পাঠ-৪ ও ৫ : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শোষণ ও ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব

বাণিজ্য বিস্তারের যুগে ইউরোপের প্রভাবশালী নৌ-শক্তির অধিকারী দেশগুলো সম্পদের সন্ধানে বহির্বিশ্বে বেরিয়ে পড়ে। তাদের অধিকাংশের লক্ষ্য ছিল পূর্বদেশসমূহ বিশেষত ভারতবর্ষ। এই উদ্দেশ্য থেকেই ১৬০০ সালে ইংলান্ডে স্থাপিত হয় 'দি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' এবং ১৬৫১ সালে হুগলিতে ও ১৬৫৮ সালে কাশিমবাজারে তারা বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। 'ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' ১৬৩০ সালে বাংলায় প্রবেশ করলেও ইংরেজ কোম্পানির সাথে টিকে থাকতে না পেরে কিছুকাল পরে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার দিকে চলে যায়। 'ফ্রেঞ্চ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' প্রতিষ্ঠা করে ফরাসিরা ১৬৬৪ সালে বাংলায় প্রবেশ করে এবং চন্দননগর ও চুঁচুড়ায় শক্ত ঘাঁটি গড়ে তোলে। তবে ইংরেজদের সাথে তিন দফা যুদ্ধে হেরে তারাও প্রায় একশো বছরের বাণিজ্য গুটিয়ে ইন্দোচীনের দিকে চলে যায়।

'দি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' ধীরে ধীরে এদেশে তাদের প্রতিপত্তি বাড়িয়ে নবাবের দরবারে প্রভাব বিস্তারের মতো ক্ষমতা ভোগ করতে শুরু করে। ১৭৫৬ সালে আলিবর্দি খাঁর মৃত্যুর পর ক্ষমতার উত্তরাধিকার নিয়ে নবাব পরিবার এবং রাজপ্রাসাদের অভিজাতদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় কোম্পানির কর্তারা এর সুযোগ নিতে ভুল করে নি। তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে তাঁর খালা ঘসেটি বেগম, মীর জাফর, মীর কাসিমসহ রাজদরবারের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ এবং উমিচাঁদ, জগত শেঠ ও রাজবল্লভদের মতো তৎকালীন ধনী অভিজাতদের একটি অংশ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে ইংরেজ বণিকরা তাদের সাথে যোগ দেয়। এই সুযোগে মাদ্রাজ থেকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে এসে ইংরেজ সেনাপতি ওয়াটসন ও ক্লাইভ কলকাতা দখল করে নেয়। এরপর নবাবের রাজধানী মুর্শিদাবাদ দখল করতে ক্লাইভ পলাশির আম্রকাননে উপস্থিত হয়। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ঘটে। নবাবকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বিজয়ের পর মীর জাফরকে নবাব বানালেও মূল ক্ষমতা চলে যায় ধূর্ত ও দুর্ধর্ষ ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভের হাতে। শেষ পর্যন্ত ১৭৬৫ সালে ক্লাইভ দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন।

দিল্লির সম্রাট শাহ্ আলমের নিকট হতে দেওয়ানি লাভের পর বাংলার নবাবকে বৃত্তিভোগীতে পরিণত করে ক্লাইভ দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করেন। দ্বৈতশাসন ছিল একটি অদ্ভুত শাসন ব্যবস্থা। এই শাসন ব্যবস্থায় ক্লাইভ বাংলার নবাবের উপর শাসন ও বিচার বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং রাজস্ব আদায় ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করেন কোম্পানির উপর। এর ফলে নবাব পেলেন ক্ষমতাহীন দায়িত্ব আর কোম্পানি লাভ করলো দায়িত্বহীন ক্ষমতা।

দ্বৈতশাসন ছিল এদেশের মানুষের জন্য এক চরম অভিশাপ। রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পেয়ে ইংরেজরা প্রজাদের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করে তা আদায়ে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। কোম্পানি

২০২০

এবং এর কর্মচারীদের অর্থের লালসা দিন দিন বাড়তে থাকে। অতিরিক্ত করের চাপে যখন জনগণ ও কৃষকের নাভিশ্বাস উঠার অবস্থা সে সময় দেশে পর পর তিন বছর অনাবৃষ্টির ফলে খরায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ১৭৭০ (বাংলা ১১৭৬) সালে বাংলায় নেমে আসে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মারা গেলেও কোম্পানি করের বোঝা কমানোর কোনো পদক্ষেপ নেয় নি। এই দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হয়েছিল। ইতিহাসে এটি ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত।

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে এদেশে একাধিক গভর্নর ছিলেন। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ওয়ারেন হেস্টিংস, লর্ড কর্নওয়ালিস, লর্ড ওয়েলেসলি, লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক, লর্ড হার্ডিঞ্জ, লর্ড ডালহৌসি প্রমুখ। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার জন্য তারা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডও গ্রহণ করেছিলেন। যেমন : যোগাযোগ– রেল, ডাক ও তার ইত্যাদি।

ইংরেজ শাসকদের গৃহীত প্রধান প্রধান কাজ নিচে উল্লেখ করা হলো–

১. ১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত ভারত শাসন আইনে বাংলায় ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেলের হাতে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা অর্পণ করা হয়।
২. ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করে ব্রিটিশদের অনুগত জমিদার শ্রেণি তৈরি করা হয়।
৩. রাষ্ট্র ও প্রশাসন পরিচালনায় ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়।
৪. মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় প্রশাসনিক বিভিন্ন দপ্তর, শিক্ষা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর করে এটিকে গুরুত্বপূর্ণ নগরীতে রূপান্তর করা হয়। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে কলকাতাই হয় বাংলার রাজধানী।

তবে এই সময়ে ইংরেজ গভর্নর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক ও লর্ড হার্ডিঞ্জ এদেশে শিক্ষা বিস্তারসহ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সূচনা করেন। এ ছাড়া সতীদাহ প্রথা ও বাল্যবিবাহ রোধ এবং বিধবা বিবাহ প্রবর্তনসহ সামাজিক কুপ্রথা নিবারণে রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো বাঙালিদের উদ্যোগকে তারা সহযোগিতা দেন। এভাবে দেশে একটি নতুন শিক্ষিত শ্রেণি ও নাগরিক সমাজ গড়ে উঠলেও বৃহত্তর বাঙালি সমাজ ইংরেজ কোম্পানির শাসনে প্রকৃতপক্ষে শোষিত হয়েছে।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দখল পেয়েই ক্ষান্ত ছিল না। দিল্লিতে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যে বিভিন্ন সংকট দেখা দেয়। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছোটোবড়ো নবাব ও দেশীয় রাজারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এর ফলে দিল্লির মসনদও দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে কোম্পানির সেনাবাহিনী নানা দিকে আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে।

১৮৫৭ সালে কোম্পানি শাসনের প্রায় একশ বছর পরে ইংরেজ অধ্যুষিত ভারতের বিভিন্ন ব্যারাকে সিপাহিদের মধ্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। বাংলায় সিপাহি মঙ্গল পান্ডে ও হাবিলদার রজব আলী এ

২০২০

বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। সিপাহিদের এই বিদ্রোহে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের স্বাধীনচেতা শাসকরাও যোগ দেয়। ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই, মহারাষ্ট্রের তাঁতিয়া টোপি এরকমই কয়েকজন। দিল্লির বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরও এদের সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু উন্নত অস্ত্র ও দক্ষ সেনাবাহিনীর সাথে চাতুর্য ও নিষ্ঠুরতার যোগ ঘটিয়ে ইংরেজরা এ বিদ্রোহ দমন করে। এরপর ১৮৫৮ সালের ২রা আগস্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত শাসন আইন পাস হয়।

কাজ : ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কী? ব্যাখ্যা কর।

পাঠ-৬ : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ শাসন বিরোধী আন্দোলন

ভারত শাসন আইন জারির ফলে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে। ভারতের রাষ্ট্র ক্ষমতা ব্রিটিশ রাজার হাতে চলে যায়। এর ফলে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা কর্তৃক একজন মন্ত্রীকে ভারতসচিব পদে (Secretary of State for India) মনোনীত করা হয়। যিনি ১৫ সদস্যবিশিষ্ট পরামর্শক সভা বা কাউন্সিলের মাধ্যমে ভারত শাসনের ব্যবস্থা করবেন। এই আইন অনুসারে গভর্নর জেনারেলকে ভাইসরয় বা ব্রিটিশ রাজ প্রতিনিধি নামে অভিহিত করা হয়। লর্ড ক্যানিং প্রথম ভাইসরয় নিযুক্ত হন। এভাবেই ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৮৬১ সালে ভারত সরকারকে বাংলায় প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা স্থাপন করার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং বঙ্গীয় আইনসভা প্রতিষ্ঠার ঘোষণাও দেওয়া হয়। ১৮৬২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে বঙ্গীয় আইনসভার কার্যক্রম শুরু হয়। সদস্য সংখ্যা প্রথমে ১২ জন ছিল। ১৮৯২ সালে ২১ জন করা হয়। শুরুতে এই সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বিধান ছিল না। পরে ভোটে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এটি গড়ে উঠে এবং এ ধারাই বাংলাসহ সারা ভারতে প্রচলিত হয়। তবে আইনসভার উপর ব্রিটিশ শাসকদের কর্তৃত্ব ঠিকই বহাল ছিল।

এদিকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৮৫৩ সালেই বাংলা প্রদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ১৯০৩ সালে এই লক্ষ্যে সীমানা নির্ধারণ করা হয়। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ সেই পরিকল্পনারই বহিঃপ্রকাশ। পূর্ববঙ্গের আলাদা পরিচয় সেখান থেকেই শুরু হয়।

ব্রিটিশ শাসনকালে (১৮৫৮-১৯৪৭) বাংলার সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল কৃষক, অন্য দিকে মুষ্টিমেয় জমিদার ছিল সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণি। সমাজে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্গে জড়িত মানুষের সংখ্যা যথেষ্ট ছিল না। বস্তুত ব্রিটিশ শাসনে বাংলার অর্থনীতির মেরুদণ্ড কৃষি ও এককালের সমৃদ্ধ তাঁতশিল্প ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছায়। বাংলার বণিক গোষ্ঠী তেমন সংগঠিত ছিল না, শিল্পেও বাংলার অবস্থান তখন উল্লেখ করার মতো নয়। সামাজিক অনুশাসনের দাপটে নারীসমাজ ব্যাপকভাবে পিছিয়ে ছিল। মধ্যবিত্ত সমাজও ততটা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে নি। ব্রিটেন ছিল সেই সময়ে পৃথিবীর প্রধান ধনী দেশ। গোটা ভারত ছিল ব্রিটেনের উপনিবেশ অর্থাৎ শোষণের ক্ষেত্র।

কাজ : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে ভারত ইংরেজদের দ্বারা কীভাবে শাসিত হয়?

পাঠ- ৭ ও ৮ : বাংলার নবজাগরণ ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব

ইংরেজরা তাদের শাসন পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে দেশীয়দের মধ্য থেকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত একটি অনুগত শ্রেণি তৈরিতে মনোযোগ দেয়। ১৭৮১ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এর একটা বাড়তি লক্ষ্য ছিল চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করে রাজ্য হারানো ক্ষুব্ধ মুসলমানদের সন্তুষ্ট করা। এরই ধারাবাহিকতায় হিন্দুদের জন্যে ১৭৯১ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় সংস্কৃত কলেজ। ইংরেজদের উদ্দেশ্য সাধনের পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শে এসে স্থানীয় মানুষের মধ্যে নতুন চেতনার স্ফূরণ ঘটতে থাকে। বহুকালের প্রচলিত বিশ্বাস, সংস্কার, বিধান সম্পর্কে তাদের মনে সংশয় ও প্রশ্ন জাগতে থাকে। হিন্দু সমাজ থেকে সতীদাহের মতো কুপ্রথার বিরুদ্ধে রীতিমতো আন্দোলন শুরু হলো, বিধবা বিবাহের পক্ষে মত তৈরি হলো। এদেশে এ সময় জ্ঞানচর্চায় সীমিত কিন্তু কার্যকর জোয়ার সৃষ্টি হয়। ইংরেজ মিশনারি স্যার উইলিয়াম কেরি খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের কর্মভূমিকা ছাড়াও নানা সামাজিক কাজে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। তিনি বাংলা ব্যাকরণ রচনা, মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সংবাদপত্র প্রকাশ, স্কুল টেক্সট বোর্ড গঠনসহ গুরুত্বপূর্ণ কাজের পথ প্রদর্শন করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় ইংরেজরা উচ্চ শিক্ষার জন্য সারাদেশে স্কুল প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি কিছু কলেজও স্থাপন করে। অবশেষে ১৮৫৭ সালে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার প্রতিষ্ঠান হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮২১ সালে শ্রীরামপুরে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনও বাংলার মানুষের মনকে মুক্ত করা ও জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে আরেকটি পথ খুলে দেয়। এর ফলে বইপুস্তক ছেপে জ্ঞানচর্চাকে শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া ও স্থায়িত্ব দেওয়ার পথ সুগম হয়। এ সময় সংবেদনশীল মানুষের নজর যায় সমাজের দিকে। সমাজের অনাচার নিয়ে যেমন তাঁরা আত্মসমালোচনা করেছেন তেমনি শাসকদের অবিচারের বিরুদ্ধেও কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ করে জনমত সৃষ্টিতে এগিয়ে আসে অনেকে।

রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্চরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারে হাত দেন। ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর প্রমুখ অবাধে মুক্তমনে জ্ঞানচর্চার ধারা তৈরি করেন। আবার বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। বাংলা সাহিত্যে মীর মশাররফ হোসেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলামের অবদানও ব্যাপক।

বাঙালির এই নবজাগরণ কলকাতা মহানগরীতে ঘটলেও এর পরোক্ষ প্রভাব সারা বাংলাতেই পড়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনামলের আধুনিক শিক্ষা ও জাগরণের আরেকটি দিক হলো দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ। সেই সাথে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও গণতান্ত্রিক অধিকার বোধেরও উন্মেষ ঘটতে থাকে।

ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত বীজ রোপিত হয়েছিল ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার পিছনে। যদিও ইংরেজ শাসকদের বক্তব্য ছিল দেশের কল্যাণ। এ সময় বাংলার সীমানা ছিল অনেক বড়। পূর্ববাংলা, পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে ছিল বৃহত্তর বাংলা। তাই কলকাতাকেন্দ্রিক ইংরেজ শাসকদের পক্ষে দূরবর্তী অঞ্চলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা কঠিন ছিল। এ কারণে পূর্ব বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার উন্নয়ন সম্ভব হয় নি। ইংরেজ ভাইসরয় লর্ড কার্জন ১৯০৩ সালে প্রস্তাব রাখেন যে,

সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাকে দুইভাগে ভাগ করা হবে। ঢাকাকে রাজধানী করে নতুন প্রদেশ করা হবে। এই প্রদেশের নাম হবে 'পূর্ব বঙ্গ ও আসাম' প্রদেশ। একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর এই প্রদেশ শাসন করবেন।

সরকারি এই সিদ্ধান্তে যুক্তি থাকলেও কলকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষিত বাঙালিদের অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন। তারা মনে করেন বাংলাকে ভাগ করার মধ্য দিয়ে ইংরেজ শাসকরা হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাঙন ধরাতে চাচ্ছেন। কারণ পূর্ববাংলার বেশিরভাগ মানুষ মুসলমান। তাই মুসলমান নেতারা ভেবেছেন নতুন প্রদেশ হলে পূর্ব বাংলার উন্নতি হবে। কিন্তু শিক্ষিত হিন্দু নেতারা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন। এ কারণে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বড় নেতাদের অধিকাংশ ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের। তারা মুসলমান নেতাদের সাথে পরামর্শ না করে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন। ফলে মুসলমান নেতাদের মধ্যে নতুন ভাবনার সৃষ্টি হয়। তারা বুঝতে পারে মুসলমানদের দাবি আদায়ের জন্য তাদের নিজেদের একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগ নামে মুসলমানদের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজদের অভিসন্ধি অনেকটা সফল হয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার পর থেকে দুই সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়। বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করা থেকে শাসকদের বিরত করার জন্য বাঙালি হিন্দু নেতারা একের পর এক চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। পাশাপাশি বিভিন্ন আন্দোলন শুরু হয়। এগুলো হচ্ছে-স্বদেশি আন্দোলন, বয়কট আন্দোলন, স্বরাজ এবং সশস্ত্র আন্দোলন। এসব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ দেশের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম জেগে উঠে এবং তারা ঐক্যবদ্ধ হয়।

এরপরেও ইংরেজ শাসন বিরোধী আন্দোলন ভারতবর্ষে দানা বাঁধতে থাকে। সারা ভারত জুড়ে যখন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন কর্মসূচি চলতে থাকে তখন এক সময় আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব বাঙালি নেতাদের হাত থেকে চলে যেতে থাকে। পুনরায় বাঙালি নেতাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য ইংরেজরা 'ভাগকর-শাসনকর নীতি' প্রয়োগ করতে থাকে। এর ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক দল হিসাবে চিহ্নিত হতে থাকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে পরিচিতি পায় মুসলিম লীগ। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মুসলমান ও হিন্দু নেতা এবং দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে নানাভাবে দ্বন্দ্ব তৈরি হতে থাকে। এতে এদেশের রাজনীতি থেকে অসাম্প্রদায়িক চেতনা কমে যেতে থাকে। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্তির পরিকল্পনা প্রদান করে। তাতে বাংলার জনগণ 'হিন্দু-মুসলমান' পরিচয়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির ক্ষেত্রে লাহোর প্রস্তাবের ধারণাই কার্যকর করা হয়। শেষদিকে বাংলা ভূখণ্ডকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্যে একটি চেষ্টা হলেও ১৯৪৬ সালের নির্বাচন এবং কলকাতা ও নোয়াখালীর দাঙ্গা সব কিছুকে অসম্ভব করে দেয়। পূর্ব-বাংলা পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল হিসাবে পূর্ব পাকিস্তান নামে ব্রিটিশ অধীনতা থেকে মুক্তি পায়। তবে তা পূর্ব-বাংলার জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠতে পারে নি। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব-বাংলার জনগণের উপর পরাধীনতা চাপিয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের পর থেকেই পূর্ব-বাংলার জনগণকে প্রকৃত স্বাধীনতার জন্যে নতুন করে আন্দোলন শুরু করতে হয়।

ঔপনিবেশিক শাসন পর্বে বাংলার জনগণের জীবনে যে দুর্ভোগ নেমে এসেছিল তা আমরা ঐ যুগের

২০২০

ইতিহাস অধ্যয়নের মাধ্যমে ধারণা লাভ করতে পারব। ১৯৪৭ সালে ইংরেজ শাসনের অবসান হয়। তবে পূর্ববাংলা বা বাংলাদেশের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা তখনো অর্জিত হয় নি। বাংলাদেশ ভূখণ্ড পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশ হয়। বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের স্বাধীনতার সংগ্রাম অব্যাহত রাখে।

কাজ-১ : বাংলায় সমাজ সংস্কারক ১০ জন মনীষীর নাম উল্লেখ কর।

কাজ-২ : বাংলায় নবজাগরণে কোন কোন প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে?

কাজ-৩ : বঙ্গভঙ্গ রদের কারণ ব্যাখ্যা কর।

কাজ-৪ : ভারত বিভক্তির কারণ ব্যাখ্যা কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন কে ?

ক. নবাব সিরাজউদ্দৌলা খ. ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ

গ. নবাব আলীবর্দি খাঁ ঘ. ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি

২. শশাঙ্কের মৃত্যুর পর একশত বছরকে মাৎস্যন্যায়ের যুগ বলা হয়। কারণ তখন-

i. দেশে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা বিরাজ করত।

ii. বড়মাছ ছোট ছোট মাছকে ধরে খেয়ে ফেলত।

iii. শাসকবর্গ সুশাসনে অক্ষম ছিল।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

আশার দাদু তাকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা প্রসংগে বললেন যে, বাংলার নবাবকে শাসন কাজের জবাবদিহি করতে হতো। তাকে এ কাজে অর্থের জন্য অন্য একটি কর্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী থাকতে হতো।

২০২০

৩. আশার দাদুর বর্ণিত ঘটনায় কোন শাসনের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে ?

ক. নবাব শাসন খ. সুবাদার শাসন

গ. দ্বৈত শাসন ঘ. ইংরেজ শাসন

৪. বর্ণিত ঘটনার ফলে –

i. দেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটে।

ii. জনগণ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

iii. জনগণের মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাব জেগে উঠে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নবীনপুর শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে থাকার ফলে এলাকাবাসী সবক্ষেত্রে অনগ্রসর ছিল। উক্ত এলাকায় স্থানীয় প্রভাবশালী ও সম্পদশালী এক ব্যক্তির উদ্যোগে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ধীরে ধীরে এলাকার মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো প্রজ্জ্বলিত হয়। কয়েক বছরের ব্যবধানে উক্ত এলাকার মানুষ সমাজ সচেতন হয়ে উঠে। এলাকার শিক্ষিত উন্নয়নকর্মী রায়হানা নারীশিক্ষা, মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে এলাকাবাসীকে সচেতন করে তোলে।

ক. ভারতে প্রথম ভাইসরয় নিযুক্ত হন কে ?

খ. বাংলা ১১৭৬ সনে এ দেশে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় কেন ?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতির মতো ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় কীসের উদ্ভব ঘটেছিল? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'রায়হানার মতো উন্নয়নকর্মীদের উদ্যোগের ফলই ভারতের স্বাধীনতার পথ সুগম করে'- উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

২০২০

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। প্রায় হাজার মাইলের ভৌগোলিক দূরত্ব, ভাষা ও সংস্কৃতিসহ সকল বিষয়ে অমিল থাকা সত্ত্বেও শুধু ধর্মীয় মিলের কারণে পূর্ব-বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের একটি প্রদেশ করা হয়। এই নতুন রাষ্ট্র পূর্ব-বাংলার মানুষের জীবনে কোনো মুক্তির স্বাদ আনতে পারে নি। শাসকের হাত বদল হয়ে পূর্ব-বাংলার জনগণ নতুন আরেকটি ভিনদেশি শাসক দ্বারা শাসিত হতে থাকে। পরবর্তীকালে অনেক আন্দোলন, সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতীক্ষা ও রক্তের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা পরিপূর্ণভাবে বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করি। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের জন্ম-ইতিহাসের পথ অনেক ঘটনাবহুল।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- ১৯৭০ এর নির্বাচনোত্তর জনগণ এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে পারব;
- ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের মূলকথা জানব ও এর গুরুত্ব ও প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন করতে পারব;
- ২৫শে মার্চের নারকীয় হত্যাযজ্ঞের বিবরণ দিতে পারব ও এর ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারব;
- ২৬শে মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা উল্লেখ করতে পারব;
- মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির বিবরণ দিতে পারব ও অস্থায়ী সরকারের গঠন ও ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব;
- মুক্তিবাহিনীর গঠন বর্ণনা করতে ও তাদের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারব;
- সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তির তৎপরতা ও ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব;
- মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিদের সহযোগিতার স্বরূপ বর্ণনা ও মূল্যায়ন করতে পারব;
- মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারব;
- মুক্তিযুদ্ধে যৌথবাহিনীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব;
- মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা ও অত্যাচারের বিবরণ দিতে পারব;
- পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের ঘটনা বলতে পারব;
- মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব;
- দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও গণতান্ত্রিক চেতনায় উজ্জীবিত হব।

পাঠ-১ : সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি

১৯৭০ সালে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিজয়ী আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ষড়যন্ত্র শুরু করে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বার বার স্থগিত ঘোষণা করলে আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের মার্চের শুরু থেকে অসহযোগ আন্দোলন এবং ৭ই মার্চ 'ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে' তোলার ডাক দেন। ফলে বাঙালির স্বাধীনতার প্রস্তুতি শুরু হয়। অন্যদিকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ২৫শে মার্চ বর্বর গণহত্যা শুরু করে। ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে শুরু হয় বাঙালির প্রতিরোধ ও মুক্তিযুদ্ধ। মুজিবনগর সরকারের নির্দেশনায় পরিচালিত নয় মাসের যুদ্ধ শেষে ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালি বিজয় লাভ করে।

২০২০

একদিকে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণের প্রস্তুতি নেয় আর অন্যদিকে জুলফিকার আলী ভুট্টো তা বানচালের জন্য ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। তিনি ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বর্জনের ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন সংকট তৈরি করেন। পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া তীব্র হয়। ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিতে আওয়ামী লীগের সকল কর্মসূচিতে জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশ নেয়। বিশেষ করে ছাত্রদের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। এছাড়া শিক্ষক, পেশাজীবী ও মহিলা সংগঠনগুলোও এগিয়ে আসে। একাত্তরের মার্চের শুরু থেকে প্রতিদিনের সকল সমাবেশে প্রচুর লোকের সমাগম ঘটে। ভুট্টোর ষড়যন্ত্রে সাড়া দিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করায় আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ফলে ওই দিন আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি কমিটির বৈঠকে সর্বাত্মক আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। জনগণ এবারও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয়। শুরু হয় বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের আরেক অধ্যায়-অসহযোগ আন্দোলন।

স্বাধীন বাংলার প্রথম পতাকা

আওয়ামী লীগ ২রা মার্চ ১৯৭১ ঢাকা শহরে ও ৩রা মার্চ সারা দেশে হরতালের ডাক দেয়। ২রা মার্চ সকাল ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিশাল সমাবেশে ছাত্রলীগ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নেতৃবৃন্দ দেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। এটিই ছিল সর্বসাধারণের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলিত 'স্বাধীন বাংলার' প্রথম পতাকা। মুক্তিযুদ্ধে এ পতাকা ছিল আমাদের প্রেরণা। ৩রা মার্চ থেকে শুরু হয় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন যা ২৫শে মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ৩রা মার্চ গঠিত হয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। এতে আন্দোলন আরও বেগবান হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়।

২০২৩

এ পরিস্থিতিতে ভীত হয়ে ইয়াহিয়া খান ৬ই মার্চ এক বেতার ভাষণে ২৫শে মার্চ ঢাকায় পুনরায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সে ঘোষণায় সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। এ পরিস্থিতিতে ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণার জন্য আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভার আয়োজন করা হয়।

কাজ : পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্যে বাঙালির প্রস্তুতির চিত্র তুলে ধর।

পাঠ-২ : ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ও বাঙালির স্বাধীনতার প্রস্তুতি

বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণে বিজয়ী দল হিসাবে আওয়ামী লীগের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশ পরিচালনার ঘোষণা দেন। জনগণের প্রতি পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সর্বাত্মক অসহযোগিতার নির্দেশ দিয়ে তিনি তাঁর ভাষণে কোর্ট-কাচারি, অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। আমরা জানি একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র পরিচালিত হয় জনগণের ট্যাক্স বা খাজনায়। তিনি তাঁর ভাষণে আরও বলেন, "যে পর্যন্ত আমার এ দেশের মুক্তি না হচ্ছে ততদিন খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো।"

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের দৃশ্য

২০২০

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ থেকে ইয়াহিয়া ও তার সহযোগী ভুট্টোর কর্মকাণ্ড দেখে বুঝেছিলেন এরা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। তাই তিনি একদিকে আলোচনা ও অন্যদিকে চূড়ান্ত সংগ্রাম ও ত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য জাতিকে প্রস্তুত হতে আহ্বান জানান। প্রয়োজনে যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তিনি বলেন, "প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।" বক্তৃতার আর এক জায়গায় তিনি বলেন, "প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।" এ কথায় গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মুক্ত করার প্রকাশ্য নির্দেশনা পাওয়া যায়। দশ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে তিনি তাঁর এ বক্তৃতায় 'বাংলাদেশ' শব্দটি ব্যবহার করে ভবিষ্যৎ নতুন রাষ্ট্রের নামকরণ চূড়ান্ত করেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে সরাসরি স্বাধীনতার কথা না বললেও বাঙালিকে তিনি স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেন। বক্তৃতায় শেষ অংশে "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" ঘোষণা দিয়ে তিনি স্পষ্টভাবেই স্বাধীনতার ডাক দেন। বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ উন্মুক্ত করতে ইয়াহিয়া ঘোষিত ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করার ব্যাপারে ৪টি পূর্বশর্ত ঘোষণা করেন।

১. সামরিক আইন প্রত্যাহার।
২. নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর।
৩. সেনাবাহিনীর গণহত্যার তদন্ত।
৪. সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া।

এ দাবিগুলো মেনে না নেওয়া পর্যন্ত তিনি অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন। ইয়াহিয়ার নেতৃত্বে পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক এ দাবিগুলো কখনো মেনে নেয় নি। ফলে বাঙালির আন্দোলন বেগবান হয়ে উঠে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। এ ভাষণ সারাদেশের মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। তাদের ঐক্যবদ্ধ করে এবং সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। এ ভাষণ যেন জাদুর স্পর্শে বাঙালি জাতিকে বীরের জাতিতে রূপান্তরিত করেছে। তাই অনেকেই মনে করেন, এ ভাষণ বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ইউনেস্কো ২০১৭ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণকে 'ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারি হেরিটেজ' হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই ভাষণ ইন্টারন্যাশনাল 'মেমোরি অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড রেজিষ্টার' এ গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টারি ঐতিহ্য হিসাবে ইউনেস্কো অন্তর্ভূক্ত করেছে। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ পৃথিবীর একমাত্র অলিখিত ভাষণ হিসাবে বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এ ভাষণের নির্দেশনা অনুযায়ী ঐক্যবদ্ধ জনগণ অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেয় এবং মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা অনুযায়ী, দেশের স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, কল-কারখানা সব বন্ধ হয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ জনতা পাকিস্তানি বাহিনীকে বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ করতে থাকে। খাজনা-ট্যাক্স আদায় বন্ধ হয়ে যায়। সেনানিবাস ব্যতীত সর্বত্র বঙ্গবন্ধুর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত

হয়। গভর্নর হাউস, সেনানিবাস কিংবা সচিবালয় থেকে নয়, সেদিন বাংলাদেশ পরিচালিত হয় বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়ি থেকে। এটাই হয় সরকারের কার্যালয়। আর আওয়ামী লীগের সদর দপ্তরে দলের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়নের কাজ চলছিল। অবস্থা উপলব্ধি করে ইয়াহিয়া ১৫ই মার্চ ঢাকা সফরে আসেন এবং বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার প্রস্তাব দেন। ১৬ই মার্চ থেকে আলোচনা শুরু হয়। ২২শে মার্চ জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় আসেন এবং আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনা ব্যর্থ করে বাঙালি নিধনের নির্দেশনা দিয়ে ২৫শে মার্চ রাতে ইয়াহিয়া-ভুট্টো ঢাকা ত্যাগ করেন। আর ওই দিনই মধ্যরাতে তারা বাঙালির উপর চরম আঘাত হানে। ওই কালরাতে পাকিস্তানি সেনারা অসংখ্য বাঙালিকে নির্বিচারে হত্যা করে।

কাজ-১ : মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র ও বাঙালিদের প্রস্তুতি বর্ণনা কর।

কাজ-২ : শ্রেণিকক্ষে আলোচনার মাধ্যমে একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে তোমার ধারণা সংক্ষেপে লেখ।

কাজ-৩ : শ্রেণিতে সবাই মিলে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ শুনে, এ সম্পর্কে তোমার মতামত লেখ।

পাঠ-৩ : ২৫শে মার্চের নারকীয় হত্যাযজ্ঞ

পাকিস্তানি সেনারা ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে গণহত্যার অভিযান চালিয়েছিল তার নাম দিয়েছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'। ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে এ অপারেশন সংগঠিত হলেও মূলত এর প্রস্তুতি চলতে থাকে মার্চের প্রথম থেকে। ওরা মার্চ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত অস্ত্র ও রসদ বোঝাই এম.ভি. সোয়াত জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৫ই মার্চ থেকে ২৪শে মার্চ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনার ভান করে আসলে অভিযানের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করেন ও অপারেশন সার্চলাইট চূড়ান্ত করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণহত্যা

অপারেশন সার্চলাইট অনুযায়ী ঢাকা শহরে গণহত্যার মূল দায়িত্ব দেওয়া হয় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমেই ঢাকা শহরের পিলখানার ইপিআর হেডকোয়ার্টার্স এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের নিয়ন্ত্রণভার পাকিস্তানি সেনাদের গ্রহণ করার কথা ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ, বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও রেডিও-টেলিভিশন নিয়ন্ত্রণ, স্টেট ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ, আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেফতার, ঢাকা শহরের যাতায়াত ব্যবস্থাসহ শহর নিয়ন্ত্রণ ছিল হানাদার সৈন্যদের প্রাথমিক দায়িত্ব। অপারেশন সার্চলাইটের

আওতায় রাজশাহী, যশোর, খুলনা, রংপুর, সৈয়দপুর, কুমিল্লায় সেনাবাহিনী, ইপিআর, আনসার, পুলিশের বাঙালি সদস্যদের নিরস্ত্র করার কথা উল্লেখ ছিল। চট্টগ্রাম বন্দর ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা দখলে রাখাও তাদের লক্ষ্য ছিল। ঢাকার বাইরে এ অপারেশনের প্রধান দায়িত্ব পান মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা। সার্বিকভাবে এ পরিকল্পনার তত্ত্বাবধান করেন গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খান।

পাকিস্তানি সৈন্যরা ২৫শে মার্চ রাত ১১.৩০ মিনিটে ঢাকা সেনানিবাস থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। এ সময় তাদের প্রথম আক্রমণের শিকার হয় ঢাকার ফার্মগেইট এলাকায় রাস্তায় মিছিলরত মুক্তিকামী বাঙালি। একই সাথে আক্রমণ চালানো হয় পিলখানা ও রাজারবাগ পুলিশলাইন্সে । বাঙালি সৈন্যরা পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করে। কিন্তু মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যদের পরিকল্পিত আক্রমণ ঠেকানোর মতো অস্ত্র ও প্রস্তুতি ছিল না তাদের। ফলে পাকিস্তানি সেনারা সেই রাতে তাদের অনেককেই নির্মমভাবে হত্যা করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে আক্রমণ পরিচালিত হয় গভীর রাতে। ইকবাল হল (বর্তমান জহুরুল হক হল) ও জগন্নাথ হলে ঢুকে পাকিস্তানি সেনারা গুলি করে ঘুমন্ত অনেক ছাত্রকে হত্যা করে। ঢাকা হলসহ (বর্তমান শহীদুল্লাহ হল) বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা এবং রোকেয়া হলেও তারা ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। মার্চের এই গণহত্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন শিক্ষকসহ ৩০০ ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মচারী নিহত হন। জহুরুল হক হল সংলগ্ন রেলওয়ে বস্তিতে সেনাবাহিনী আগুন দিলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সংগঠিত হয়। শুধু ২৫শে মার্চ রাতেই ঢাকায় ৭ থেকে ৮ হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়।

ঢাকার বাইরে সারা দেশে সেনানিবাস, ইপিআর ঘাঁটিতে আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানি সেনারা অসংখ্য বাঙালি সেনাকে হত্যা করে। এভাবে আক্রমণের শুরুতেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের পুলিশ ও ইপিআর ঘাঁটিগুলোর উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এসব এলাকায় বহু নিরীহ লোককে হত্যা করা হয়।

অপারেশন সার্চলাইট অনুযায়ী, ২৫শে মার্চ রাত দেড়টায় (২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে) বঙ্গবন্ধুকে তাঁর ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাসা থেকে পাকিস্তানি বাহিনী গ্রেফতার করে। তবে গ্রেফতারের আগেই তিনি স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে দেশবাসীকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান।

কাজ- ১ : অপারেশন সার্চ লাইটের আওতায় সংগঠিত গণহত্যার দৃশ্য দলগতভাবে অভিনয় করে দেখাও।

কাজ- ২ : অপারেশন সার্চলাইটের ভয়াবহ রূপ বর্ণনা কর। ২০২০

পাঠ- ৪ : ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বঙ্গবন্ধু তাঁর সেই স্বাধীনতার ঘোষণায় কী বলেছিলেন? তিনি বলেন, "ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছে, যাহার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ কর। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও" (বাংলাদেশ গেজেট, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী, ৩রা জুলাই, ২০১১)। স্বাধীনতার এ ঘোষণা বাংলাদেশের সকল স্থানে তদানীন্তন ইপিআর এর ট্রান্সমিটার, টেলিগ্রাম ও টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ তা প্রচারে এগিয়ে আসেন। এদিকে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের কয়েকজন উৎসাহী দেশপ্রেমিক কর্মী বেতারের কালুরঘাট সম্প্রচার কেন্দ্রকে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রে' রূপান্তরিত করেন। ২৬শে মার্চ দুপুরে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হান্নান এই বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি প্রচার করেন। ২৭শে মার্চ সন্ধ্যায় একই বেতার কেন্দ্র হতে বাঙালি সামরিক অফিসার মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। বেতারে প্রচারিত স্বাধীনতার এই ঘোষণা সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। সকলেই স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠে। ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে মুক্তিযুদ্ধ একটি বাস্তব রূপ লাভ করে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক প্রস্তুতি বিক্ষিপ্তভাবে শুরু হলেও ক্রমান্বয়ে এটি একটি গণযুদ্ধে রূপ নেয়। এদেশের সর্বস্তরের মানুষ, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবকদের সঙ্গে সেনাবাহিনী, ইপিআর, পুলিশ ও আনসারে কর্মরত বাঙালিরা এতে অংশ নেয়।

কাজ- ১ : বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা এবং স্বাধীনতা সম্পর্কিত অন্যান্য ঘোষণা সম্পর্কে শিক্ষকের সহায়তায় সংক্ষেপে লেখ।

পাঠ- ৫ : মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি ও অস্থায়ী সরকার গঠন

মুক্তিযুদ্ধে গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। একে কখনো অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার, আবার কখনো প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারও বলা হয়। তবে এটি মুজিবনগর সরকার নামে বেশি পরিচিত। এ সরকারের নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত ও পরিচালিত হয় এবং বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়।

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল গঠিত হয় মুজিবনগর বা বাংলাদেশ সরকার। ওই দিনই মন্ত্রিসভা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ২৬শে মার্চ ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণা অনুমোদন করে। তবে মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল। শপথ বাক্য পাঠ করান অধ্যাপক ইউসুফ আলী।

আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি (পদাধিকার বলে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক)। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি (বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক) এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। অন্য তিন জন মন্ত্রী ছিলেন অর্থমন্ত্রী এম. মনসুর আলী, স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী এ এইচ এম কামারুজ্জামান, পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ।

মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রম

মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রমকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়- ক. বেসামরিক কার্যক্রম খ. সামরিক কার্যক্রম।

প্রত্যেক দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও এর অধীনে দপ্তর থাকে। মুজিবনগর সরকারেরও তা ছিল। এগুলো হচ্ছে– প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, অর্থ-শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়, সাধারণ প্রশাসন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ, প্রকৌশল বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, যুব ও অভ্যর্থনা শিবিরের নিয়ন্ত্রণ বোর্ড, সংস্থাপন, আঞ্চলিক প্রশাসন, তথ্য ও বেতার, স্বরাষ্ট্র, সংসদ বিষয়ক, কৃষি ইত্যাদি।

বাংলাদেশকে ১১টি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করে সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্য বা আওয়ামী লীগ নেতাদের অঞ্চলগুলোর দায়িত্ব দেওয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে নয় সদস্যবিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। আওয়ামী লীগ নেতা ছাড়াও এর সদস্য ছিলেন প্রবীণ জননেতা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) এর সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, কমিউনিস্ট পার্টি প্রধান মণি সিংহ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) এর আরেক অংশের সভাপতি মোজাফফর আহমদ ও কংগ্রেস নেতা মনোরঞ্জন ধর। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করে গঠিত হয় মুজিবনগর সরকারের পরিকল্পনা কমিশন।

কাজ : মুজিবনগর সরকারের পরিচয় দাও।

২০২০

পাঠ-৬ : মুক্তিবাহিনী গঠন ও কার্যক্রম

মুজিবনগর সরকার সুষ্ঠু ও পরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন কর্নেল এম.এ.জি. ওসমানী। এছাড়া চিফ অব স্টাফ ছিলেন কর্নেল (অব.) আবদুর রব। ডেপুটি চিফ অব স্টাফ ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার।

মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টর : মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে ১১ জন সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। প্রত্যেক সেক্টর বেশ কয়েকটি সাব-সেক্টরে বিভক্ত ছিল। সেক্টরগুলোর পরিচয় নিচে তুলে ধরা হলো-

এক নম্বর সেক্টর : চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ফেনী নদী পর্যন্ত এলাকা।

দুই নম্বর সেক্টর : নোয়াখালী, আখাউড়া, ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত, কুমিল্লা জেলা, সিলেট জেলার হবিগঞ্জ (বর্তমানে জেলা), ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ।

তিন নম্বর সেক্টর : আখাউড়া, ভৈরব রেললাইন থেকে পূর্ব দিকে কুমিল্লা জেলা, সিলেট, ঢাকা জেলার অংশবিশেষ ও কিশোরগঞ্জ।

চার নম্বর সেক্টর : সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল, খোয়াই-শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইন ছাড়াও পূর্ব ও উত্তর দিকে ডাউকি সড়ক পর্যন্ত অঞ্চল।

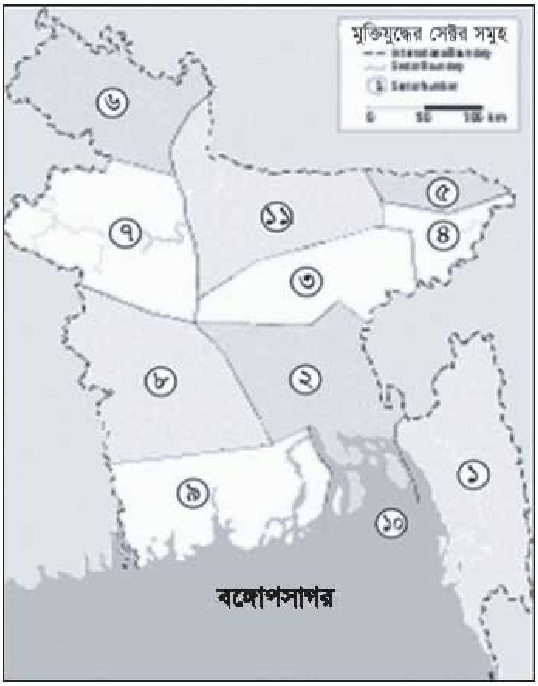

মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টরের মানচিত্র

পাঁচ নম্বর সেক্টর : সিলেট জেলার পশ্চিমাঞ্চল, সিলেট-ডাউকি সড়ক থেকে সুনামগঞ্জ-ময়মনসিংহ সড়ক পর্যন্ত এলাকা।

ছয় নম্বর সেক্টর : রংপুর জেলা, দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও মহকুমা (বর্তমানে জেলা)।

সাত নম্বর সেক্টর : দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চল, রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলা।

আট নম্বর সেক্টর : কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুরের অধিকাংশ এবং খুলনা জেলার দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক পর্যন্ত এলাকা।

নয় নম্বর সেক্টর : দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক থেকে খুলনা জেলার দক্ষিণাঞ্চল, ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ এবং বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা।

দশ নম্বর সেক্টর : দশ নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল নৌ-কমান্ডো, সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল ও অভ্যন্তরীণ নৌপথ।

এগার নম্বর সেক্টর : কিশোরগঞ্জ ছাড়া ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা।

ব্রিগেড ফোর্স

১১টি সেক্টর ও তার অধীন অনেক সাব-সেক্টর ছাড়াও রণাঙ্গনকে তিনটি ব্রিগেড ফোর্সে বিভক্ত করা হয়। ফোর্সের নামকরণ করা হয় ব্রিগেডগুলোর অধিনায়কদের নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে। মেজর জিয়াউর রহমান ছিলেন 'জেড ফোর্স', মেজর কে.এম. শফিউল্লাহ ছিলেন 'এস ফোর্স' এবং মেজর খালেদ মোশাররফ 'কে ফোর্স'– এর অধিনায়ক।

নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনী

মুক্তিবাহিনী সরকারি পর্যায়ে দুইটি শাখায় বিভক্ত ছিল – ১. নিয়মিত বাহিনী ও ২. অনিয়মিত বাহিনী।

১. নিয়মিত বাহিনী : ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটগুলোর বাঙালি সৈনিকদের নিয়ে এই বাহিনী গঠিত হয়। সরকারিভাবে এদের নামকরণ করা হয় এম. এফ. (মুক্তিফৌজ)। মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ সরকার নিয়মিত বাহিনী হিসাবে সেনা, বিমান ও নৌবাহিনীও গড়ে তোলে।

কমলাপুর রেলস্টেশনে ঢাকার গেরিলাদের অপারেশন

২. অনিয়মিত বাহিনী : ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, কৃষক ও সকল পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বিভিন্ন সেক্টরের অধীনে অনিয়মিত বাহিনী গঠিত হয়। এই বাহিনীর সরকারি নামকরণ ছিল 'গণবাহিনী' বা এফ. এফ. (ফ্রিডম ফাইটার বা মুক্তিযোদ্ধা)। তাদের নিজ নিজ এলাকায় গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করা হতো। এছাড়া ছাত্রলীগের বাছাইকৃত কর্মীদের নিয়ে গঠিত হয় 'মুজিববাহিনী'। কমিউনিস্ট পার্টি ন্যাপ (মোজাফফর), ন্যাপ (ভাসানী) ও ছাত্র ইউনিয়নের আলাদা গেরিলা দল ছিল।

আঞ্চলিক বাহিনী : সেক্টর এলাকার বাইরে আঞ্চলিক পর্যায়ে যেসব বাহিনী গড়ে উঠে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-কাদেরিয়া বাহিনী (টাঙ্গাইল), আফসার ব্যাটালিয়ন (ভালুকা, ময়মনসিংহ), বাতেন বাহিনী (টাঙ্গাইল), হেমায়েত বাহিনী (গোপালগঞ্জ, বরিশাল), হালিম বাহিনী (মানিকগঞ্জ), আকবর বাহিনী (মাগুরা), লতিফ মীর্জা বাহিনী (সিরাজগঞ্জ, পাবনা) ও জিয়া বাহিনী (সুন্দরবন)। এছাড়া ছিল ঢাকার গেরিলা দল, যা 'ক্র্যাক প্লাটুন' নামে পরিচিত। ঢাকা শহরের বড় বড় স্থাপনা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ব্যাংক ও টেলিভিশন ভবনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় ঢাকার গেরিলারা। এভাবে তারা পাকিস্তানি সেনা ও সরকারের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করে।

শুধু স্থলপথে নয় নৌপথে 'অপারেশন জ্যাকপট' নামে পরিচালিত অভিযান চলাকালে একদিনে চট্টগ্রাম বন্দরে ১০টি এবং মংলা বন্দরে ৫০টি জাহাজ ধ্বংস করে মুক্তিযোদ্ধা নৌকমান্ডোগণ সারা পৃথিবীতে সাড়া ফেলে দেন।

কাজ-১ : বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরগুলো চিহ্নিত কর।

কাজ-২ : মুজিবনগর সরকারের গঠন ও কাজের বর্ণনা দাও।

পাঠ-৭ : মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী শক্তির তৎপরতা ও ভূমিকা

তখনকার হিসাবে বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের প্রায় সকলেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল। তবে এদেশের মানুষের একটি ক্ষুদ্রাংশ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা ও দেশবাসীর স্বার্থের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তারা পাকিস্তানি বাহিনীকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে।

পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার নামে ও ধর্মের দোহাই দিয়ে এই স্বাধীনতা-বিরোধীরা পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে মিলে হত্যা, লুট, অগ্নিকাণ্ড, নারী নির্যাতনসহ সারা দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিকামী বাঙালি ও প্রগতিশীল বাঙালিদের খুঁজে বের করে তাদের তালিকা পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে তুলে দেয়। তাদের অত্যাচার কখনো কখনো পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারকেও ছাড়িয়ে যেতো।
মুক্তিযুদ্ধের সময় গড়ে উঠেছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বেশ কয়েকটি সহযোগী সংগঠন–

শান্তি কমিটি : ৯ই এপ্রিল গঠিত হয় ১৪০ সদস্যবিশিষ্ট 'ঢাকা নাগরিক শান্তি কমিটি'। এ কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিল মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী জামায়াতে ইসলামি, নেজামে ইসলামি, পিডিপি ও মুসলিম লীগ নেতারা। মধ্য এপ্রিলে গঠিত কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির কার্যক্রম জেলা, থানা এমনকি কোথাও কোথাও ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মূলত এরাই পাকিস্তানি বাহিনীকে পথ চিনিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়ে যায়।

রাজাকার : মুক্তিযুদ্ধের সময় উগ্র-ধর্মান্ধ রাজনৈতিক দলগুলোর প্রত্যক্ষ সহায়তা ও তত্ত্বাবধানে রাজাকার বাহিনী গড়ে উঠে। জামায়াত নেতা মওলানা এ কে এম ইউসুফ ১৯৭১ সালের মে মাসে খুলনায় সর্বপ্রথম রাজাকার বাহিনী গঠন করেন। ধীরে ধীরে অন্যান্য জায়গায়ও রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়। ইসলামি ছাত্র সংঘ ও অন্যান্য উগ্র-ধর্মভিত্তিক দলের সদস্যরা ছাড়াও দাগি আসামি ও বেকার যুবকরা রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেয়।

আলবদর : আলবদররা ছিল সাক্ষাৎ যমদূত। জামায়াতে ইসলামি ছাত্র সংগঠন ইসলামি ছাত্র সংঘের ছাত্রদের নিয়ে এ বাহিনী গড়ে উঠে। ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে পাকিস্তানি বাহিনী বুদ্ধিজীবী অপহরণ, নির্যাতন ও হত্যার যে পরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়ন করে আলবদর বাহিনী।

২০২০

আল-শামস : আল-শামস আলবদরের মতোই আরেকটি সংগঠন। মুসলিম লীগ ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনগুলো সম্মিলিতভাবে আল-শামস বাহিনী গঠন করে।

ডা. মালিক মন্ত্রিসভা

পাকিস্তান সরকার বহির্বিশ্বকে বিভ্রান্ত করতে সামরিক গভর্নর জেনারেল টিক্কা খানকে সরিয়ে তার জায়গায় বেসামরিক ব্যক্তি ডা. আবদুল মোতালিব মালিককে গভর্নর নিযুক্ত করে। তার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী তথাকথিত বেসামরিক সরকার ১৭ই সেপ্টেম্বর গঠিত হয়। ১০ সদস্যবিশিষ্ট মালিক মন্ত্রিসভা পাকিস্তানি সামরিক জান্তার পক্ষ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং বিভিন্ন বক্তৃতা-বিবৃতি ও নির্দেশের মাধ্যমে স্বাধীনতা-বিরোধী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। ১৪ই ডিসেম্বর এ সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

কাজ : মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী বিভিন্ন দল ও সংগঠনের পরিচয় দাও।

পাঠ-৮ : মুক্তিযুদ্ধে দেশি ও বিদেশি সহযোগিতা

মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বাঙালিরা গণহত্যার প্রতিবাদে ও মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে একত্রিত হতে থাকে। যুক্তরাজ্যকে কেন্দ্র করে সমগ্র ইউরোপে প্রবাসীদের আন্দোলন চলে। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, সুইডেন, ফ্রান্স, কানাডা ও ইন্দোনেশিয়ার বাঙালিরাও সোচ্চার হয়ে উঠে। গণহত্যার প্রতিবাদে তারা সভা-সমাবেশ আয়োজন করে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন ও অর্থ সংগ্রহ করে। কেউ কেউ ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ শেষে যুদ্ধে অংশ নেয়। বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন আদায়ের জন্য মুজিবনগর সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বিশেষ দূত নিয়োগ করে। তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিদেশে সমর্থন আদায় ও জনমত গঠনের চেষ্টা করেন। যারা এ সময় জীবন ও চাকরির মায়া ত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দেয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইরাক, ফিলিপাইন, আর্জেন্টিনা, ভারত ও হংকং দূতাবাসের বাঙালি কর্মকর্তারা। তাদের পদত্যাগ ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর প্রচেষ্টায় জাতিসংঘে ৪৭টি দেশের প্রতিনিধি বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। এতে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুদণ্ড স্থগিত রাখতে পাকিস্তান সরকার বাধ্য হয়।

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকেই মুজিবনগর সরকার দিল্লি ও কলকাতায় বাংলাদেশের দুটি মিশন স্থাপন করে। কলকাতাতেই প্রথম বাংলাদেশ মিশন স্থাপিত হয়। এছাড়া মুজিবনগর সরকার ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক ও লন্ডনে বাংলাদেশ মিশন স্থাপন করে। এসব মিশন বাংলাদেশের পক্ষে মিছিল, সমাবেশ, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, পার্লামেন্ট সদস্যদের সমর্থন আদায়, বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবদান রাখে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পৃথিবীর বৃহৎ কয়েকটি দেশ যেমন- যুক্তরাষ্ট্র, তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন এবং প্রতিবেশী ভারত বিভিন্নভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। এসব দেশের মধ্যে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সরাসরি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন ছিল পাকিস্তানের পক্ষে।

২০২০

শরণার্থী শিবির

ভারত সরকার ২৫শে মার্চ থেকে সংগঠিত পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার নিন্দা করে। গণহত্যার হাত থেকে বাঁচতে সীমান্ত পেরিয়ে আসা প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে ভারত আশ্রয় দেয় এবং তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়। ভারতের মাটিতে এপ্রিলের শেষ দিকে বাঙালি যুবকদের সশস্ত্র ট্রেনিং দেওয়া শুরু হয় যা নভেম্বর মাস পর্যন্ত চলে। পাশাপাশি কলকাতায় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার পরিচালনা ও 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' নামে এই সরকারের বেতার কেন্দ্র স্থাপনে ভারত সহায়তা করে। এছাড়া ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীসহ বিভিন্ন মন্ত্রী নেতা ও কর্মকর্তারা বিদেশ সফর করে বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনে ভূমিকা রাখেন। ৩রা ডিসেম্বর ভারতের বিমান ঘাঁটিতে পাকিস্তান বিমান হামলা চালালে চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হয়। এ সময় পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তেও পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

৬ই ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ইতোমধ্যে নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথবাহিনী গঠিত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত হয় যৌথবাহিনী। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সে দেশের সর্বস্তরের জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও সব ধরনের সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসে। সরকারের পাশাপাশি ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল, বেসরকারি সংগঠন, লেখক-শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী সম্প্রদায় সকলেই এ সময় আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। বাঙালি শরণার্থীদের ব্যয় নির্বাহের জন্য ভারত সরকার এ সময় 'শরণার্থী কর' নামে নতুন একটি কর আরোপ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে চার হাজার ভারতীয় অফিসার ও জোয়ান প্রাণ বিসর্জন দেয়।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা রেখেছিল। এপ্রিলের শুরুতেই সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পদগর্নি বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে চিঠি দেন। ৩রা ডিসেম্বর চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধবিরতি বিলম্বিত

করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য ছিল যৌথবাহিনী যাতে সামরিক বিজয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও সুযোগ পায়। যৌথবাহিনীকে ঢাকা দখল করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে কোনো প্রকারে যুদ্ধবিরতির পদক্ষেপকে ঠেকিয়ে রাখাই নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেটো দানের উদ্দেশ্য ছিল। তাদের এ উদ্দেশ্য সফল হয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি নীতি ছিল পাকিস্তানের পক্ষে। প্রথমদিকে অস্ত্র এবং সমর্থন দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানকে সহায়তা করে। তবে নিজ দেশের বিরোধী দলের চাপে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভারতে অবস্থানরত বাঙালি শরণার্থীদের জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়েছিল। ১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ শুরুর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র প্রচণ্ড ভারত-বিরোধী ও পাকিস্তান-ঘেঁষা নীতি অনুসরণ করতে থাকে। স্বভাবতই তাদের ভূমিকা বাংলাদেশের বিপক্ষে যায়। এ সময় যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সমর্থনে ভারত মহাসাগরে তাদের সপ্তম নৌবহর পাঠায়। সোভিয়েত ইউনিয়নও পাল্টা নৌবহর পাঠায়। তবে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে শেষ পর্যন্ত তারা সে নৌবহরকে কাজে লাগায় নি। পাকিস্তানের পরাজয়ের মুখে যুদ্ধ বিরতি ঘটিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে বাধাগ্রস্ত করতেও জাতিসংঘে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। তবে যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা কংগ্রেসের অনেক সদস্য, বিভিন্ন সংবাদপত্র, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদসহ যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সর্বস্তরের জনগণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা পালন করে। নিউইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পী জর্জ হ্যারিসন 'বাংলাদেশ কনসার্ট' আয়োজন করে তা থেকে প্রাপ্ত অর্থ মুজিবনগর সরকারের কাছে তুলে দেন। ভারতের খ্যাতিমান শিল্পী রবি শঙ্কর মুক্তিযুদ্ধে মানুষকে উজ্জীবিত করেন। তিনি বাংলাদেশ কনসার্টের আয়োজকদের মধ্যে অন্যতম।

এডওয়ার্ড কেনেডির শরণার্থী শিবির পরিদর্শন

কনসার্টে জর্জ হ্যারিসন

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ অপারেশন সার্চলাইট শুরু হওয়ার সময় থেকে বিদেশি সাংবাদিকরা পাকিস্তানিদের গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করে। তারাই প্রথম বহির্বিশ্বে বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা ও বর্বরতার খবর ছড়িয়ে দেয়। সাইমন ড্রিং এরকমই একজন সাংবাদিক। ১৯৭১ এর মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তান সরকার কিছু বিদেশি সাংবাদিককে নিয়ন্ত্রিতভাবে বাংলাদেশের কোনো কোনো এলাকা সফর করিয়ে তাদের পক্ষে প্রতিবেদন লেখানোর ফন্দি আঁটে। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। নিজ চোখে সব দেখে তারা পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতা সম্পর্কে অবহিত হয় এবং সত্য কথা লিখে পত্রিকা ও বেতারের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে তা অবহিত করে। এভাবে এন্থনি ম্যাসকারেনহাস গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের চাঞ্চল্যকর তথ্য সারা বিশ্বে প্রকাশ করেন। বিবিসির সাংবাদিক মার্ক টালি পুরোটা সময় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে খবর প্রচার করে গেছেন। এদিকে দেশে অবরুদ্ধ থেকেও অনেক বাঙালি সাংবাদিক ঝুঁকি নিয়ে বিদেশে খবর পাঠিয়েছে। এজন্য তাদের শত্রুর হাতে চরম মূল্যও দিতে হয়। একাত্তরের শহিদ নিজামউদ্দিন ও নাজমুল হক এরকমই দুজন সাংবাদিক। এছাড়া আকাশবাণী, বিবিসি, ভোয়া প্রভৃতি বেতারকেন্দ্র আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছিল। আকাশবাণী কলকাতা থেকে প্রতি রাতে প্রচারিত 'সংবাদ পরিক্রমা' খুবই জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ছিল। এটি পাঠ করে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের ঘরে ঘরে পরিচিত হয়ে উঠেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের 'বজ্রকণ্ঠ' ও 'চরমপত্রসহ' বিভিন্ন অনুষ্ঠান শ্রোতাদের মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছে।

কাজ- ১ : মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষ ও বিপক্ষ শক্তির পরিচয় ও ভূমিকা বর্ণনা কর।

কাজ- ২ : মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকার গুরুত্ব উল্লেখ কর।

কাজ- ৩ : মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

কাজ- ৪ : গ্রন্থাগার, জাদুঘর ও অন্যান্য সূত্র থেকে খবর ও চিত্র সংগ্রহ করে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি দেয়াল পত্রিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ- ৯ : যৌথবাহিনীর নেতৃত্বে চূড়ান্ত যুদ্ধ

যৌথবাহিনীর অভিযান

মুজিবনগর সরকারের সেক্টরভিত্তিক যুদ্ধ পরিকল্পনার ফলে একাত্তরের মে মাস থেকেই মুক্তিযোদ্ধারা রণাঙ্গনে সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনীর মোকাবিলা শুরু করে। জুন মাস থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাঙালি গেরিলা যোদ্ধারা দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পাকিস্তানি বাহিনীর উপর ব্যাপক আক্রমণ চালাতে থাকে। এতে পাকিস্তানি বাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে। মূলত মধ্য নভেম্বর থেকে ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনীকে সম্মুখ যুদ্ধে কার্যকর সহায়তা দিতে থাকে। ১৩ই নভেম্বর ট্যাংকসহ দুই ব্যাটালিয়ন ভারতীয় সৈন্য যশোরে ঘাঁটি স্থাপন করে। পাকিস্তানি বাহিনীর উপর আরও সুদৃঢ় আক্রমণের জন্য ২১শে নভেম্বর বাংলাদেশ ও ভারত সরকার একটি যৌথবাহিনী গঠন করে। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে এটি গঠিত হয়। যুদ্ধকালীন মুক্তিবাহিনীর সহায়তাকারী ভারতীয় বাহিনীকে মিত্রবাহিনী বলা হতো। যৌথবাহিনী গঠনের ফলে স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধ দারুণ গতি লাভ করে।

৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তানি বিমানবাহিনী ভারতের কয়েকটি বিমান ঘাঁটিতে হামলা চালালে শুরু হয়ে যায় পাক-ভারত সর্বাত্মক যুদ্ধ। যৌথবাহিনীর অধীনে বাংলাদেশ সীমান্তে এ সময় আক্রমণ শুরু হয়। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহে চালানো হয় বিমান হামলা। ৬ই ডিসেম্বর ভারত সার্বভৌম দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। পরের দিন যশোর বিমান বন্দরের পতনের পর যৌথবাহিনী যশোর শহরে প্রবেশ করে। ৮ থেকে ৯ই ডিসেম্বরের মধ্যে কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নোয়াখালী শহর যৌথবাহিনীর দখলে আসে। ১০ই ডিসেম্বর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালকে নিরপেক্ষ এলাকা ঘোষণা করে ঢাকাস্থ কূটনৈতিকবৃন্দ ও বিদেশি নাগরিকদের সেখানে আশ্রয় দেওয়া হয়। ঐদিন বিশেষ বিমানযোগে ঢাকা থেকে ব্রিটিশ ও অন্যান্য বিদেশি নাগরিকদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। ১১ থেকে ১২ই ডিসেম্বরের মধ্যে ময়মনসিংহ, হিলি, কুষ্টিয়া, খুলনা, রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর ও সিরাজগঞ্জ মুক্ত হয়।

যৌথবাহিনীর শেষ যুদ্ধ

১২ই ডিসেম্বর ঢাকায় বিভিন্ন সামরিক অবস্থানের উপর যৌথবাহিনীর বিমান হামলা চলে। যৌথবাহিনী চারদিক থেকে ঢাকা অভিমুখে রওয়ানা হয়। এর মধ্যে দেশের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ শুরু হয়ে যায়। পূর্ব-পাকিস্তানের তাবেদার সরকারের গভর্নর ডা. মালিক ভয়ে পদত্যাগ করে তার মন্ত্রীদের নিয়ে নিরপেক্ষ এলাকায় অর্থাৎ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় নেয়। ১৪ই ডিসেম্বরের মধ্যে ঢাকা ছাড়া দেশের অন্যত্র অনেক বড় শহর ও সেনানিবাসে পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। ঐ দিনই পাকিস্তানি বাহিনীর যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। ঢাকা শহরের চারদিক তখন যৌথবাহিনী ঘেরাও করে রাখে। যে কোনো সময় ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ ঘটতে পারে অবস্থা সে রকম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। আত্মসমর্পণের সুবিধার্থে যৌথবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল স্যাম মানেকশ'র আহ্বানে উভয় পক্ষ ১৬ই ডিসেম্বর বিকেল তিনটা পর্যন্ত যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয়।

যৌথবাহিনীর গভর্নর হাউস আক্রমণের পর

কাজ-১: মুক্তিবাহিনী, মিত্রবাহিনী ও যৌথবাহিনী সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

কাজ-২: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ছবি সংগ্রহ করে যৌথভাবে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন কর।

পাঠ-১০ : গণহত্যা ও নির্যাতন

দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয় মাস জুড়ে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। আমরা এর আগে জেনেছি, ২৫শে মার্চ মধ্যরাত থেকে নিরস্ত্র বাঙালিদের উপরে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। রাতেই তারা সেনানিবাস, ইপিআর দপ্তর, পুলিশলাইন্স ও আনসার ব্যারাকে হামলা চালিয়ে বাঙালি সদস্যদের হত্যা ও বন্দি করতে শুরু করে।

পাকিস্তানি বাহিনী আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের দেখামাত্র হত্যার নীতি গ্রহণ করে। সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় ছিল তাদের নির্বিচার হত্যার প্রধান শিকার। তাদের বাড়িঘর, দোকানপাট, পাড়া ও গ্রাম লুট করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী সমাজ ছিল পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসরদের বিশেষ টার্গেট। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে ও শেষ পর্যায়ে এভাবে দেশকে মেধাশূন্য করার পরিকল্পনা থেকে তারা বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপকভাবে হত্যা করে।

দেশের অভ্যন্তরে মানুষ ছিল অবরুদ্ধ, অনেকে পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকার-আলবদরদের ভয়ে পুরো নয় মাস দেশের ভিতরে আত্মগোপন করে জীবন কাটিয়েছে। আর প্রায় এক কোটি মানুষ দেশ ছেড়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। শরণার্থী শিবিরে বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে, অপুষ্টিতে ও রোগে ভুগে বহু শিশু প্রাণ হারায়। বৃদ্ধ ও নারীদের জীবনেও নেমে আসে চরম নিপীড়ন। একইভাবে দেশের ভিতরে অবরুদ্ধ মানুষও পাকস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসরদের গণহত্যার শিকার হয়। পাকিস্তানি বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য এদেশের মুসলিমলীগ ও জামায়াতে ইসলামির নেতারা রাজাকার, আলবদর, আল-শামস বাহিনী গঠন করে। এই সকল বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল গোলাম আজম, মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহ্সান মোহাম্মদ মুজাহিদ, কাদের মোল্লা, কামারুজ্জামানসহ অনেকে। তারা বাংলাদেশ, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিকামী মানুষের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এদের সহায়তায় পাকিস্তানি বাহিনী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে। লুণ্ঠন, ঘরবাড়ি ও হাট বাজারে অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতনের মতো ঘৃণিত কাজে রাজাকার, আলবদর, আল-শামস বাহিনী সরাসরি জড়িত ছিল।

৩রা ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে যৌথবাহিনীর আক্রমণের ফলে পাকিস্তানের পরাজয় যখন নিশ্চিত তখন তারা বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করার নীল নকশা তৈরি করে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, সঙ্গীতজ্ঞদের ধরে নিয়ে নির্মম নির্যাতন করে হত্যা করে। ১৯৭১ এর ১০ থেকে ১৪ই ডিসেম্বর এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গোবিন্দ চন্দ্র দেব, শহীদুল্লা কায়সার, মুনীর চৌধুরী ও জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, চিকিৎসক ডা. ফজলে রাব্বী ও ডা. আলিম চৌধুরী, সাংবাদিক নিজামউদ্দিন ও সিরাজউদ্দিন হোসেন, দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা, নূতন চন্দ্র সিংহ, রাজনীতিবিদ ধীরেন দত্ত ও মশিউর রহমান, লেখিকা সেলিনা পারভীন ও মেহেরুন্নেসা, সাহিত্যিক শহীদ সাবের ও আনোয়ার পাশা, সঙ্গীতজ্ঞ আলতাফ মাহমুদের মতো বরেণ্য ব্যক্তিগণ। বিজয় অর্জনের পরে এসব সূর্য সন্তানদের লাশ রায়ের বাজারসহ বিভিন্ন বদ্ধভূমিতে পাওয়া যায়। দেশের ভিতরে সংগঠিত হয় নিরাপরাধ লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ড। এই অপরাধের দায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আল-শামস বাহিনীর উপর বর্তায়।

এই পরিকল্পিত গণহত্যা চালাতে গিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা এদেশে অনেক বধ্যভূমি তৈরি করেছে। এর মধ্যে কয়েকটি বড় বধ্যভূমি হলো ঢাকার রায়েরবাজার, চট্টগ্রামের পাহাড়তলি, খুলনার খালিশপুর, সিলেটের শমসেরনগর ইত্যাদি। সারাদেশে বিভিন্ন জেলা ও মহকুমায় নির্জন নদীতীর ও চা বাগানেও অসংখ্য বধ্যভূমি গড়ে তুলেছিল ঘাতকরা।

এই গণহত্যা চলেছে সারাদেশে পুরো নয় মাস জুড়ে। যদিও খুবই নিষ্ঠুর ও লোমহর্ষক তবুও পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের নির্যাতনের ধরন সম্পর্কে আমাদের কিছুটা হলেও জানা দরকার। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নির্যাতন করে পরে তারা আটককৃতদের হাত-পা বেঁধে গুলি করে হত্যা করে নদী, জলাশয় ও গর্তে ফেলে রাখতো। এছাড়া একটি একটি করে অঙ্গচ্ছেদ করে গুলি করে হত্যা

করতো। চোখ উপড়ে ফেলা, মাথায় আঘাত করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা, মুখ থেঁতলে দেওয়া, বেয়নেট ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে হৃদপিণ্ড উপড়ে ফেলা, আঙ্গুলে সুঁচ ফুটানো, নখ উপড়ে ফেলা, শরীরের চামড়া কেটে লবণ ও মরিচ দেওয়া ছিল অত্যাচারের নিষ্ঠুর ধরন। বন্দীশালা ও বধ্যভূমি থেকে বেঁচে আসা অনেকের কাছ থেকে পাওয়া বিবরণ আরও ভয়াবহ যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

কাজ-১: দলগতভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিশিষ্ট শহিদদের ছবি সংগ্রহ করে পরিচিতিসহ অ্যালবাম তৈরি কর।

কাজ-২ : স্কুলে মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদান ও তাঁদের অভিজ্ঞতা শোনার জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন কর।

পাঠ- ১১ : পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয় ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে। ঐদিন হানাদার বাহিনী তাদের শোচনীয় পরাজয় মেনে নিয়ে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী নিয়ে গঠিত যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। আমরা লাভ করি প্রিয় মাতৃভূমি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

আত্মসমর্পণের দৃশ্য

আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন যৌথবাহিনীর কমান্ডার লে.জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি মুক্তিবাহিনীর উপ-প্রধান সেনাপতি গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে. খন্দকার। আত্মসমর্পণের দৃশ্য দেখার জন্য রেসকোর্স ময়দান লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। জয়বাংলা শ্লোগানে ঢাকার আকাশ বাতাস মুখরিত হতে থাকে। রেসকোর্স ময়দানের খোলা আকাশের নিচে একটি টেবিলে বসে যৌথবাহিনীর পক্ষে লে. জেনারেল অরোরা এবং পরাজিত পাকিস্তানি

১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় উল্লাস

বাহিনীর পক্ষে লে. জেনারেল এ.এ.কে নিয়াজি আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন। বন্দী করা হয় পাকিস্তানি বাহিনীর প্রায় ৯৩ হাজার সদস্যকে।

এভাবে আমাদের মুক্তিবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ লড়াই, সমগ্র বাঙালি জাতির স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও দৃঢ় ঐক্য, মিত্রবাহিনীর সক্রিয় সহায়তা এবং বিশ্ব জনমতের সমর্থনে মাত্র নয় মাসে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ তার সফল সমাপ্তিতে পৌঁছে। আর আমরা লাভ করি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

কাজ : আত্মসমর্পণের সময় রেসকোর্স ময়দানের দৃশ্য বর্ণনা কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ১৯৭১ সালের কোন তারিখে মুজিব নগর সরকার গঠিত হয়?

ক. ২৬শে মার্চ　　খ. ১০ই এপ্রিল

গ. ২৭শে মার্চ　　ঘ. ১৭ই এপ্রিল

২. ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল–

i. জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বর্জন করা

ii. কলকারখানা বন্ধ করে দেওয়া

iii. সর্বত্র বঙ্গবন্ধুর নিয়ন্ত্রণে চলে আসা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী নাওমি ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। তার ছবিতে একজন লোক চশমা পরা, কোটপরা, একটি আঙ্গুল উঁচু করে ভাষণ দিচ্ছেন আর উপস্থিত জনতা উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে।

৩. নাওমির অঙ্কিত চিত্রে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?

ক. হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী
খ. আবুল কাশেম ফজলুল হক
গ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
ঘ. মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

৪. উদ্দীপকে উক্ত ব্যক্তির ভাষণ প্রধানত কীসের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে?

ক. ভাষা আন্দোলনের
খ. স্বাধীনতা আন্দোলনের
গ. ছয় দফা আন্দোলনের
ঘ. অসহযোগ আন্দোলনের

সৃজনশীল প্রশ্ন

১।

চিত্র-১ : ২য় বিশ্বযুদ্ধের গণহত্যার দৃশ্য

চিত্র-২ : মুক্তিযুদ্ধচলাকালীন যৌথবাহিনীর অভিযানের দৃশ্য

ক. আত্মসমর্পন দলিলে যৌথবাহিনীর পক্ষে কে স্বাক্ষর করেন?
খ. 'গণহত্যার' ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।
গ. চিত্র- ১ বাংলাদেশের ইতিহাসের কোন ঘটনার প্রতিচ্ছবি?
ঘ. চিত্র- ২ এ উল্লিখিত বাহিনীর কার্যক্রমই কি এ দেশের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করেছিল? বিশ্লেষণ কর।

২. নাসিফের বাবা মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি প্রশিক্ষণ নিতে এসে সাতক্ষীরা এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে আমাদের প্রতিবেশী দেশ বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং দিয়ে এবং বাংলাদেশের পক্ষে বিদেশে জনমত গড়ে সাহায্য সহযোগিতা করেছিল।

ক. আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলার পতাকা কত তারিখ উত্তোলন করা হয়?
খ. যৌথবাহিনী গঠন করা হয়েছিল কেন?
গ. নাসিফের বাবা মুক্তিবাহিনীর কোন সেক্টরের সদস্য ছিলেন? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির সহযোগিতাই এদেশের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছিল? মূল্যায়ন কর।

তৃতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন

আমরা সপ্তম শ্রেণিতে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ধারণা পেয়েছি। এখন আমরা জানব সংস্কৃতি কী এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়? এছাড়া এ অধ্যায়ে আমরা বাঙালির সংস্কৃতি ও শিল্পকলা সম্পর্কে ধারণা লাভ করব। সংস্কৃতি বলতে আমরা সাধারণত সমাজের মানুষের জীবন-যাপনের ধারাকে বুঝে থাকি। অর্থাৎ সংস্কৃতি হলো আমাদের জীবন-প্রণালি। মানুষ তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে এবং তার মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণের লক্ষ্যে যা কিছু সৃষ্টি করে তা-ই হলো তার সংস্কৃতি। মূলত মানুষের এসব সৃষ্টি বা কাজ দুই ধরনের হয়ে থাকে। একটি হলো বস্তুগত অপরটি অবস্তুগত। সংস্কৃতিকেও তাই দুইভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। বস্তুগত সংস্কৃতি ও অবস্তুগত সংস্কৃতি। বস্তুগত সংস্কৃতি হচ্ছে ঘরবাড়ি, তৈজসপত্র, আসবাবপত্র, উৎপাদন হাতিয়ার। অবস্তুগত সংস্কৃতি হচ্ছে ব্যক্তির দক্ষতা, জ্ঞান, চিন্তা-ভাবনা, আচার-ব্যবহার, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, সংগীত, সাহিত্য ও শিল্পকলা ইত্যাদি। সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল। আদিকাল হতে সমাজে বসবাসকারী মানুষ তার সৃষ্টিকে বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক সাংস্কৃতিক জীবনে উন্নীত করেছে। সংস্কৃতির এই পরিবর্তনে বিভিন্ন উপাদান যেমন প্রভাব বিস্তার করেছে তেমনি সংস্কৃতির উন্নয়নেও এসব উপাদান কমবেশি অবদান রেখেছে। আদিম সমাজ ছিল সহজ সরল ও শ্রেণিহীন। হাতিয়ার আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই জীবন ও জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে প্রথম পরিবর্তন আসে। গাছের ডালপালা ও নুড়িপাথরই ছিল মানুষের প্রথম হাতিয়ার। পরবর্তীকালে মানুষ যখন তীর, ধনুক, বর্শা ইত্যাদি হাতিয়ার তৈরি করে, তখন এইসব হাতিয়ারের উপর নির্ভর করে তাদের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হয়। হাঁটি হাঁটি পা পা করে মানুষ হাঁটতে শিখে। এটিকে বলা হয় তার শারীরিক বিকাশ বা উন্নয়ন। তেমনি মানুষের ব্যবহার্য ও ভোগের সামগ্রী এবং চিন্তা চেতনায় যখন পরিবর্তন লক্ষ করা যায় তখন তাকে বলা হয় মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন। এ অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, উন্নয়ন এবং বাঙালির সংস্কৃতি ও শিল্পকলা সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা –

- সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বলতে কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সাথে উন্নয়নের ধারণা কীভাবে যুক্ত তা ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- বাংলাদেশে কীভাবে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটেছে তা ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- বাঙালির সংস্কৃতি ও শিল্পকলা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব ;
- উন্নত সংস্কৃতিকে অনুশীলন করব এবং এর সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করব ;
- নিজ সংস্কৃতির প্রতি সচেতন এবং শ্রদ্ধাশীল হব ।

২০২০

পাঠ-১ : বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন ধারণা

মানুষ সমাজে মিলেমিশে বাস করে। এভাবে বাস করতে গিয়ে সে নিজের প্রয়োজনে নানা কিছু সৃষ্টি করে। মানুষের সৃষ্টিশীল সকল কাজই তার সংস্কৃতি। সমাজ ও অঞ্চল ভেদে সংস্কৃতির রূপ ভিন্ন হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মানুষ ও সমাজের রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি। এদেশের সংস্কৃতি কিন্তু এক জায়গায় থেমে নেই। পরিবেশ-পরিস্থিতি ও যুগের সাথে তাল মিলিয়ে নিজেদের প্রয়োজন মিটাতে আমাদের সংস্কৃতিরও পরিবর্তন ঘটছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত বা ইতিবাচক পরিবর্তনই উন্নয়ন। সংস্কৃতি এক প্রজন্ম হতে অন্য প্রজন্মে হস্তান্তরিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় হস্তান্তরিত হতে হতে সংস্কৃতির মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে। আবার অন্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেও সংস্কৃতি তার রূপ বদল করে। একেই সংস্কৃতির পরিবর্তন বা সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বলে।

পরিবর্তন যে ধরনেরই হোক, সংস্কৃতি স্থির নয়। মানুষ যে পরিবেশে বাস করে তার মধ্যে থেকে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটতে পারে আবার বাইরের উপাদান সংগ্রহ করেও এই সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হতে পারে।

সাধারণভাবে উন্নয়ন বলতে বোঝায় কোনো কিছু শুরু থেকে ক্রমশ পরিপূর্ণতা লাভ করা। একসময় উন্নয়ন বলতে কেবল অর্থনৈতিক অবস্থার কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন বা অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে বোঝানো হতো। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীরা উন্নয়ন বলতে 'সামাজিক উন্নয়ন' কথাটিকে নির্দেশ করেন। তাই মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নই প্রকৃত উন্নয়ন। সাধারণত উন্নয়ন বা সামাজিক উন্নয়ন হলো একধরনের 'সামাজিক পরিবর্তন'। কোনো সমাজের উন্নয়নের ফলে যেমন সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হয় তেমনি সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ফলেও সমাজে উন্নয়ন ঘটে। যেমন: বাংলাদেশে অনেক জায়গায় এখন লাঙলের পরিবর্তে ট্রাক্টর ব্যবহার হচ্ছে, এটা বস্তুগত সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। এর ফলে কৃষি উৎপাদন বেড়ে যাওয়ায় মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন হয়েছে। এইভাবে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন সমন্বিতভাবে সমাজের উন্নয়ন ঘটায়।

কাজ : ভাত মাছ খাওয়ার পাশাপাশি বার্গার খাওয়াকে কী ধরনের পরিবর্তন বলে তুমি মনে কর?

পাঠ-২ : সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য

আমরা উপরে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন সম্পর্কে জেনেছি। এখন সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে আলোচনা করা হলো–

১. সমাজে সকলের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি সাধন, শোষণ ও বৈষম্যের মাত্রা কমানো বা অবসান করা, জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে মানব কল্যাণে কাজে লাগানোই উন্নতি বা উন্নয়নের লক্ষ্য। মানুষের জীবনযাত্রার প্রণালি হচ্ছে সংস্কৃতি। জ্ঞানবিজ্ঞান, প্রযুক্তি প্রভৃতির উন্নয়ন সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকেই নির্দেশ করে। তাই অনেক সময় সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নকে সমার্থক মনে হয়। এই সাংস্কৃতিক পরিবর্তনও উন্নয়নের একটি বৈশিষ্ট্য।

২. বস্তুগত সংস্কৃতি যত দ্রুতগতিতে পরিবর্তন হয় অবস্তুগত সংস্কৃতি তত দ্রুত পরিবর্তন হয় না। ফলে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের এই অসমতা সমাজে সমস্যা তৈরি করে যা সমাজে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সংস্কৃতির পরিবর্তনের এই গতি বা পার্থক্য সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য। আর উন্নয়নের গতি বা ধীরগতির উপর নির্ভর করে সংস্কৃতির বিভিন্ন অংশের পরিবর্তনের মাত্রা হচ্ছে উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য।

৩. উন্নয়ন মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের অগ্রাধিকার দেয়। এটি উন্নয়নের একটি বৈশিষ্ট্য। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ হলে সমাজের অগ্রগতি ঘটে, উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। ফলে সমাজে নানা ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যা সামাজিক পরিবর্তন হিসাবে গণ্য করা হয়। আর সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটে।

৪. সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- পরিবর্তন সকল সময় একটি সরলরেখায় ক্রমশ ঊর্ধ্বগতিতে এগিয়ে যায় না। অনেক সময় সাংস্কৃতিক পরিবর্তন নিম্নগতির দিকেও যায়। তাই ঊর্ধ্বগতি ও নিম্নগতি দুটোই পরিবর্তন। একটি ইতিবাচক অন্যটি নেতিবাচক। তবে উন্নয়ন বলতে ঊর্ধ্বগতি বা ইতিবাচক পরিবর্তনকে বোঝায়। তাই সংস্কৃতির উন্নয়ন হলো সংস্কৃতির ইতিবাচক পরিবর্তন।

৫. সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন দুটোই সময়ের মাত্রার মধ্যে সংগঠিত হয়। এটিও পরিবর্তনের একটি বৈশিষ্ট্য। যেমনঃ পুরাতন পাথর যুগ ও নতুন পাথরের যুগ দুইটি সময়কাল। দুই সময়ের সংস্কৃতিতে পার্থক্যও আছে। এই পার্থক্য সময়ের পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে এই পরিবর্তন পরবর্তী সময়েও ধারাবাহিকভাবে ঘটে থাকে। যেমন: পুরাতন পাথর যুগের অনেক হাতিয়ার নতুন পাথর যুগের সময়ে উন্নতি ঘটেছে। এটি হচ্ছে সংস্কৃতির উন্নয়ন তথা সাংস্কৃতিক পরিবর্তন।

কাজ :	সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য দুইটি উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধর।

পাঠ– ৩ : সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের বিভিন্ন দিক

আমরা জানি সংস্কৃতি স্থির বিষয় নয়। পরিবর্তন সংস্কৃতির ধর্ম। পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিতে ভিন্নতা থাকলেও সেখানে প্রতিনিয়ত সংযোজন ও বিয়োজন চলে। একসময় সংস্কৃতির পার্থক্য বা পরিবর্তনশীলতার মধ্যে আবার নতুন সংস্কৃতির পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটে। সংস্কৃতির এই পরিবর্তনশীলতার কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমনঃ ২০২০

সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি : সাধারণত দুইটি সমাজের সংস্কৃতি একে অপরের সংস্পর্শে এসে একে অপরকে প্রভাবিত করে। এই কাছে আসা যত বেশি দীর্ঘস্থায়ী হবে সংস্কৃতির আদান-প্রদান তত বেশি হবে। এর মাধ্যমে একে অপরের সংস্কৃতির কিছু না কিছু গ্রহণ করবে। সংস্কৃতির এই চলমান গতিধারা এবং এক সমাজ থেকে আরেক সমাজে সংস্কৃতির প্রসার লাভকে সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি বলে। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক প্রসার বা ব্যাপ্তি ঘটে। বিশ্বায়নের ফলে এবং প্রযুক্তির উন্নতিতে সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি অনেক বেড়ে গেছে।

সাংস্কৃতায়ন : নিজ সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ন রেখে অন্য কোনো সাংস্কৃতিক উপাদানকে নিজ সংস্কৃতির সাথে আত্মস্থ করার প্রক্রিয়াকে সাংস্কৃতায়ন বলা হয়। আমাদের দেশ বহুবার বহিরাগত শাসক দ্বারা শাসিত হওয়ায় এখানে সাংস্কৃতায়ন প্রবল। ভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শই সাংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার কারণ বলে মনে করা হয়। যেমন : ইংরেজরা প্রায় দুইশত বৎসর আমাদের শাসক ছিলো বলে অনেক ইংরেজি শব্দ আমাদের ভাষায় মিশে গেছে।

সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ : আত্তীকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী অন্যের সংস্কৃতি আয়ত্ত করে। যেমন: মানুষ যখন কোনো নতুন সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক পরিবেশে বসবাস করতে আসে তখন সেখানকার মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ, চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ এক কথায় সমগ্র জীবনধারার সাথে আত্তীকৃত হতে চেষ্টা করে। এভাবে একসময় তা আত্তীকরণ হয়ে যায়। যেমন: জীবিকার প্রয়োজনে, বৈবাহিক কারনে অথবা অন্য যেকোনো কারনে নিজ এলাকা থেকে স্থানান্তর হলে মানুষ ঐ এলাকার সংস্কৃতির সাথে নিজেকে আত্তীকরণ করতে চেষ্টা করে।

সাংস্কৃতিক আদর্শ : প্রতিটি দেশ বা সমাজের রয়েছে নিজস্ব একটি সাংস্কৃতিক আদর্শ। সাংস্কৃতিক আদর্শ বলতে কোনো দেশ বা সমাজের মানুষের সংস্কৃতির ধরনকে বোঝায়। এগুলো হলো- আচার-আচরণ, খাদ্য, পোশাক, বিশ্বাস, ধর্মবিশ্বাস, লোককাহিনি, সংগীত, লোককলা ইত্যাদি। কোনো দেশ বা সমাজের সাংস্কৃতিক আদর্শের মাঝে ঐ দেশ বা সমাজের মানুষের জীবনপ্রণালি ও বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে। এই আদর্শের কারণে সংস্কৃতিসমূহের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

প্রযুক্তি ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন : আধুনিক প্রযুক্তি বা বস্তুগত সংস্কৃতির দ্রুত পরিবর্তন ও উন্নয়ন সমাজে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে গোটা বিশ্ব এখন একটি বিশ্বপল্লিতে রূপান্তরিত হয়েছে। যার ফলে যোগাযোগ প্রক্রিয়া অনেক উন্নত হয়েছে। এখন ঘরে বসে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের খবর জানা যায়। এক সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসছে। অনুন্নত সংস্কৃতি দ্রুত উন্নত সংস্কৃতির উপাদান গ্রহণ করছে। এভাবে প্রযুক্তি সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটাচ্ছে।

কাজ : কীভাবে সাংস্কৃতিক সংমিশ্রন ঘটে উদাহরণ দাও।

পাঠ- ৪ : বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন

বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষের জীবন আচরণ বা সংস্কৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। একে বলা হয় সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব সবচেয়ে বেশি। এছাড়া ধর্মীয় সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতির প্রভাবও একেবারে কম নয়; যেমন : পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, শিক্ষা, কৃষি, চিকিৎসা, প্রযুক্তি, সংগীত, কলা, দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ,ফ্যাশন ইত্যাদিতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে অনেক পরিবর্তন এসেছে। যাকে আমাদের সংস্কৃতি থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনে তো বটেই শহরের জীবনেও ইদানিং বিভিন্ন লোক উৎসব, বর্ষবরণ, মেলা ইত্যাদির আধিক্য ও বিভিন্ন লোক সামগ্রীর সম্ভার দেখে এই পরিবর্তন স্পষ্টই চোখে পড়ে। বিশ্বায়নের প্রভাবেও বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতিতে পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। আগে যেমন যাত্রা, পালাগান, সার্কাস, জারিসারির মাধ্যমে মানুষ বিনোদনের চাহিদা পূরণ করত, বর্তমানে ঘরে বসে ফেসবুক, মিডিয়ার মাধ্যমে সে চাহিদা পূরণ করছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে।

বস্তুগত ও অবস্তুগত উভয় সংস্কৃতিতে আমাদের দেশে পরিবর্তন ঘটেছে। তবে এক্ষেত্রে বস্তুগত সংস্কৃতি এগিয়ে আছে। যত দ্রুত আমরা ফ্রিজ, টেলিভিশন গ্রহণ করি ততদ্রুত অন্য দেশের ধ্যান-ধারণা, দৃষ্টিভংগি ও বিলাস সামগ্রী গ্রহণ করতে পারি না। বাংলাদেশে পারিবারিক ব্যবস্থায় বা পারিবারিক সম্পর্কে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে, পূর্বের যৌথ পরিবার ভেঙে এখন একক পরিবার গ্রাম শহর উভয় স্থানে গড়ে উঠেছে, যা তাদের আচার-আচরণে ও জীবনযাপন পদ্ধতিতে প্রকাশ পাচ্ছে।

অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের ফলে পরিবারে নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর সমঅধিকার ও নারী স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা নারী-পুরুষের চিরায়ত সম্পর্কে পরিবর্তন এনেছে। এখন নারী-পুরুষ একত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে।

প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আমাদের সংস্কৃতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। যার ফলে বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত হচ্ছে।

কাজ : সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের কয়েকটি উদাহরণ দাও।

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

সংস্কৃতির বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদানের ইতিবাচক বা উর্ধ্বমুখী পরিবর্তন সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। বিশেষ করে প্রযুক্তি এক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছে। এছাড়া, শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, গবেষণা, খেলাধুলা, বিনোদন, রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্য, বৈদেশিক সম্পর্ক ও বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, নারী-পুরুষ সম্পর্ক ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটেছে।

কৃষি, শিল্প, চিকিৎসা ও শিক্ষায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে, যা বাংলাদেশের মানুষের সংস্কৃতিতে উন্নয়ন বয়ে আনছে।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুসরণে আমাদের দেশে বিভিন্ন ব্যাংক, বিমা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, রেস্টুরেন্ট, হোটেল, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, বহুজাতিক কোম্পানি, আধুনিক বিপণী বিতান ইত্যাদির সম্প্রসারণ হয়েছে। ফলে এগুলোকে ঘিরে এক ধরনের সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরি হয়েছে যা সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধন করছে।

বিশ্বের উন্নত দেশের অনুকরণে প্রচলিত ধারার শিক্ষার সাথে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার চেষ্টা চলছে। আবার প্রচলিত ধারার শিক্ষার পাশাপাশি দূরশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষাকে মানুষের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এসব পরিবর্তন মূলত শিক্ষা সংস্কৃতিরই পরিবর্তন, যা শিক্ষার সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটিয়েছে।

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম বা প্রাইভেট চ্যানেল প্রতিষ্ঠার ফলে সাংস্কৃতিক বিপ্লব হয়েছে। যার মাধ্যমে সংস্কৃতির বিস্তার ঘটছে দ্রুত এবং জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে তাদের আচরণে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটছে। এটি একটি সাংস্কৃতিক উন্নয়ন।

কাজ : মাটির প্লেট থেকে চিনামাটির প্লেটের ব্যবহারকে কী বলা যায়?

পাঠ- ৫ : বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের বিকাশ ধারা

বাঙালি সমৃদ্ধ সংস্কৃতির অধিকারী একটি প্রাচীন জাতি। মানুষ যেভাবে জীবনযাপন করে, যেসব জিনিস ব্যবহার করে, যেসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করে, যা কিছু সৃষ্টি করে, সব নিয়েই তার সংস্কৃতি। খাদ্য, বাসস্থান, তৈজসপত্র, যানবাহন, পোশাক, অলঙ্কার, উৎসব, গীতবাদ্য, ভাষা-সাহিত্য সবই তার সংস্কৃতির অংশ। তবুও এর মধ্যে সৃষ্টিশীল কিছু কিছু কাজ সংস্কৃতির বিচারে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এসব কাজে একটি জাতির চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলোকে আমরা বলি শিল্পকলা। আমরা আমাদের সেই সব সৃষ্টিশীল সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত হব এবং দৃশ্যশিল্প, সাহিত্যশিল্প ও সঙ্গীতশিল্প এই তিন শাখায় আমাদের অবদান ও কীর্তি স্মরণ করব।

দৃশ্যশিল্প : এগুলো বেশিরভাগই বস্তুগত শিল্প বা সংস্কৃতি হিসাবে পরিচিত। পলিমাটিতে গড়া আমাদের এই দেশ। এই দেশে একদিকে মাটি আর অন্যদিকে এ মাটিতে জন্মানো বাঁশ মানুষের ঘর তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছে। বাঙালির ঐতিহ্যবাহী সুনির্মিত ঘর হলো মাটির তৈরি ও বাঁশের তরজার

২০২০

ছাউনিযুক্ত দোচালা, চারচালা, এমনকি আটচালা। কখনো কখনো বাঁশের কাঠামোর উপর শন দিয়ে চাল ছাওয়া হয়েছে। এখনও আমাদের গ্রামগঞ্জে বেশির ভাগ ঘরই এরকম।

একসময় ছাঁচ অনুযায়ী মাটির তৈরি ইট দিয়ে মন্দির বানানো হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে শিল্পমূল্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মাটির ফলক বা পাত তৈরি করে তাতে ছবি অঙ্কন করে পুড়িয়ে স্থায়ী রূপ দেওয়া। এগুলোকে টেরাকোটা বা পোড়ামাটির শিল্প বলা হয়। দিনাজপুরের কান্তজি মন্দিরে এভাবে পোড়ামাটির শিল্পকর্মে রামায়ণের কাহিনিসহ নানা সামাজিক জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারেও পোড়ামাটির প্রচুর কাজ আছে। এতে সেকালের সমাজ জীবনের ছবি পাওয়া যায়। কালো রঙের কষ্টিপাথর আর নানা রকম মাটি দিয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি বানানোর ঐতিহ্যও বেশ পুরনো।

তবে পালযুগে তালপাতার পুঁথিতে দেশীয় রঙ দিয়ে যেসব ছবি আঁকা হয়েছে তার প্রশংসা আধুনিক বিশ্বের শিল্পরসিকদের কাছ থেকেও পাওয়া যাচ্ছে। হাজার বছর পরেও ছবিগুলো চমৎকার ঝকঝকে রয়েছে। পুঁথিগুলো ছিল বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের।

বাংলার তাঁতশিল্পের সুনাম বহুকালের। প্রাচীন বাংলার দুকূল কাপড়ের বেশ খ্যাতি ছিল। কৌটিল্য বলেছেন, পুণ্ড্রদেশের (উত্তরবঙ্গ) দুকূল শ্যামবর্ণ এবং মণির মতো মসৃণ। দুকূল ছিল খুব মিহি আর ক্ষৌমবস্ত্র একটু মোটা। পত্রোর্ণ নামে এন্ডি বা মুগা জাতীয় সিল্ক তৈরি হতো মগধ ও পুণ্ড্রে। সেকালে এদেশের দুকূল, পত্রোর্ণ, ক্ষৌম ও কার্পাস কাপড় বিদেশে রপ্তানি হতো।

বাংলায় বিভিন্ন সময় যেসব কাপড় উৎপন্ন হতো তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো খাসা, এলাচি, হামাম, চৌতা, উতানি, সুসিজ, কোসা, মলমল, দুরিয়া, শিরবান্দ ইত্যাদি। বাংলার বিখ্যাত মসলিন কাপড় এতই সূক্ষ্ম ও উন্নতমানের ছিল যে এ কাপড় নিয়ে বহু কাহিনি বা কিংবদন্তির সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলার শাড়ির খ্যাতিও বহুকালের– সিল্ক, জামদানি, টাঙ্গাইল, মসলিন, গরদ ইত্যাদি এখনও সুপরিচিত।

সুলতানি আমল থেকে বাংলার স্থাপত্যশিল্পে ইরানি প্রভাব পড়তে শুরু করে। গম্বুজ ও খিলানসহ মসজিদ তো নির্মিত হয়েছেই, অনেক দপ্তর ও বাড়িঘরও তৈরি হয়েছে এই রীতিতে। ছোট সোনা মসজিদ, নবাব কাটরা, ঢাকার লালবাগের কুঠি এ সময়ের স্থাপত্য নিদর্শন।

বাংলার নকশিকাঁথার কথা না বললেই নয়। গ্রামীণ মহিলারা ঘরে ঘরে কাঁথা সেলাই করে তাতে আশ্চর্য নিপুণতায় গল্পকাহিনি ও ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। এখনও গ্রামীণ সমাজের দরিদ্র নারীরা এই শিল্পকর্মটি টিকিয়ে রেখেছেন।

এছাড়া কাঠের কাজ বা কারুশিল্প, শঙ্খের কাজ, বাঁশ-বেত ও শোলার কাজেও বাংলার মানুষ যেমন দক্ষতা দেখিয়েছে তেমনি তাদের সৃজনশীল মনের প্রকাশ ঘটিয়েছে।

কাজ- ১ : বাঙালির সংস্কৃতি ও শিল্পকলার বিকাশে ভূমিকা রেখেছে এমন কয়েকটি দৃশ্যশিল্পের উল্লেখ কর।

কাজ- ২ : পোড়ামাটির কাজ বলতে কী বুঝায়? কয়েকটি কাজের দৃষ্টান্ত দাও।

কাজ- ৩ : বাংলার প্রাচীন দৃশ্যশিল্পের তালিকা তৈরি কর। এসবের নিদর্শন ও ছবি দিয়ে শ্রেণিকক্ষে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন কর।

সাহিত্য : বাঙালির প্রথম যে সাহিত্যকর্মের সন্ধান পাওয়া যায় তা চর্যাপদ নামে পরিচিত। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রথম নেপালের রাজ দরবার থেকে এগুলো আবিষ্কার করেন। পরে ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ চর্যাপদের কাল নির্ণয় করেন। তিনি গবেষণা করে জানান প্রায় বারোশো বছর আগে বৌদ্ধ সাধকরা এগুলো লিখেছেন। এখন হয়ত আমাদের পক্ষে এগুলো বোঝা কঠিন হবে। তাছাড়া শাব্দিক অর্থ ছাড়াও এগুলোর ভাবার্থও বুঝতে হয়। এগুলোই হলো আদি বাংলা সাহিত্যের নমুনা। চর্যাগীতির বিখ্যাত রচয়িতাদের মধ্যে ছিলেন লুইপা এবং কাহ্নপা প্রমুখ। আমরা নিচে চর্যাপদের একটি নমুনা ও তার অনুবাদের সঙ্গে পরিচিত হব।

লুই পা লিখেছেন–

কা আ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল
চঞ্চল চীএ পইঠা কাল ॥

বাংলায় এর শাব্দিক অর্থ হলো–

শ্রেষ্ঠ তরু এই শরীর, পাঁচটি তার ডাল। চঞ্চল চিত্তে কাল (ধ্বংসের প্রতীক) প্রবেশ করে।

এর ভাবার্থ হলো– শরীরের পাঁচটি ইন্দ্রিয় পাঁচটি ডাল স্বরূপ। এই পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে জানাশোনা চলে। এতে বেশি আকৃষ্ট হলে বস্তুজগতকেই মানুষ চরম ও পরম জ্ঞান করে ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

সুলতানি আমলে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ভাবধারার প্রভাবে বাংলায় কীর্তন গান রচনার জোয়ার আসে। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার কাহিনি নিয়ে এসব আবেগপূর্ণ গান রচিত হয়েছে। এগুলো বৈষ্ণব পদাবলী নামে পরিচিতি। বৈষ্ণব সমাজব্যবস্থায় হিন্দু-মুসলমানে এতই ঘনিষ্ঠ ভাব ছিল যে অনেক মুসলমান কবিও পদাবলী রচনা করেছেন।

দেশীয় দেবদেবীকে নিয়েও নানা কাব্যকাহিনি রচিত হয়েছে এক সময়। এগুলো মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এছাড়া ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে সেকালের বাংলার সমাজচিত্র পাওয়া যায়।

মুসলমান সমাজে পুঁথি সাহিত্যের ব্যাপক কদর ছিল। পারস্য থেকে পাওয়া নানা কল্পকাহিনি এবং রোমান্টিক আখ্যান নিয়ে এগুলো রচিত হতো। সেকালে বাড়ি বাড়ি পুঁথি পাঠের আসর বসত, আবার পুঁথি নকল করে সংরক্ষণও করা হতো। ইউসুফ-জুলেখা, লায়লি-মজনু, সয়ফুল মুলক বদিউজ্জামাল, জঙ্গনামা ইত্যাদি বিখ্যাত সব পুঁথির নাম। আলাওল রচিত পদ্মাবতী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে আলোচিত।

ইংরেজ আমলে উনিশ শতকে আমাদের দেশে বাংলা গদ্যের সূচনা হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত গড়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র ও সমসাময়িক সাহিত্যিকরা যার উপর সৌধ তুলেছেন আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে শোভন ও সুন্দর করে পূর্ণতা দিয়েছেন। কাজী নজরুল ইসলাম, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মীর মশাররফ হোসেন, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশে ভূমিকা রেখেছেন।

কাজ- ১ : বাংলার সাহিত্য বিকাশের একটি ধারাবাহিক চিত্র দাও।

কাজ- ২ : বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কয়েকটি নিদর্শনের পরিচয় দাও।

সংগীত শিল্প

বাংলা চিরকালই সংগীতের দেশ। এখানকার মাঠে-প্রান্তরে কৃষক হাল চাষ করতে করতে যেমন গান বেঁধেছে তেমনি নদী ও খালে নৌকা বাইতে বাইতে মাঝিও গলা ছেড়ে গান গেয়েছে। আবার সাধারণ মানুষ তার মতো করে গানের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সাধনা করেছে। আমরা সাহিত্য-শিল্পের আলোচনায় আমাদের দুই আদি সংগীত চর্যাপদ ও বৈষ্ণব পদাবলীর কথা আগেই জেনেছি। কীর্তনগান প্রধানত হিন্দু সমাজে হতো, এখনও হয়। তবে বাউল ও ভাটিয়ালি গান গ্রামের হিন্দু-মুসলমান সকলেই গেয়ে থাকে। মুর্শিদি, পালাগান, বারমাস্যা, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা ইত্যাদি বহু ধরনের আঞ্চলিক লোকগান ছড়িয়ে আছে সারা বাংলা জুড়ে।

শহরাঞ্চলে একসময় পাঁচালি, খেউড়, খেমটা প্রভৃতি গানের আসর বসত। তবে উত্তর ভারতের সংস্পর্শে এসে হিন্দুস্থানি উচ্চাঙ্গ সংগীতের সাথে বাঙালি সংগীত সাধকদের পরিচয় ঘটে। তার প্রভাবে এখানে নাগরিক সংগীতের বিকাশ ঘটে। নিধুবাবু, কালী মির্জা প্রমুখ হয়ে রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলার নাগরিক গান উৎকর্ষের শীর্ষে পৌঁছায়। তাঁরই গান আজ আমাদের জাতীয় সংগীত– 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। এ গানের সুর তিনি নিয়েছেন

বাউল গানের সুর থেকে। রবীন্দ্রনাথের পথ ধরে পরে আরও অনেকেই বাংলার নাগরিক গানকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের মধ্যে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম আপন স্বাতন্ত্র্যে ও বৈচিত্র্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। মাত্র কুড়ি বছরের সৃষ্টিশীল জীবনে তিনি প্রায় ছয় হাজারের মতো গান লিখেছেন। অতুল প্রসাদ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন আধুনিক বাংলা গানের সমৃদ্ধিতে এদের অবদানও ব্যাপক।

কাজ : বাঙালির সংগীত সম্ভারের পরিচয় দাও।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পূর্বের যানবাহন গরুর গাড়ির পরিবর্তে বর্তমানে মোটর গাড়ির ব্যবহার এটিকে বলে-

ক. সামাজিক পরিবর্তন খ. সাংস্কৃতায়ন

গ. সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ ঘ. সাংস্কৃতিক পরিবর্তন

২. বাঙালিরা ইংরেজ শাসকের অধীনে থাকায় অনেক ইংরেজি শব্দ বাংলায় মিশে আছে এটিকে কী বলে?

ক. সাংস্কৃতিক আদর্শ খ. সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি

গ. সাংস্কৃতায়ন ঘ. সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ

৩. বাঙালি পুরুষেরা পহেলা বৈশাখে পাঞ্জাবী ও মেয়েরা শাড়ী পরে। এটাকে কী বলে?

ক. সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ খ. সাংস্কৃতিক আদর্শ

গ. সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি ঘ. সাংস্কৃতায়ন

৪. নিচের কোনটি শিক্ষার সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ফল?

ক. শ্রেণিকক্ষে স্পিকার ব্যবহার খ. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের দলগত কাজ করা

গ. শিক্ষার্থীর বাড়ির কাজ প্রদর্শন ঘ. শিক্ষার্থীর মুখস্ত পড়া

৫. কীর্তন গান রচনায় মুসলমান কবিগণও অংশগ্রহণ করেছিলেন। কেননা সুলতানি আমলে−

i. হিন্দু মুসলমানদের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ

ii. শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ভাবধারার প্রভাব ছিল ব্যাপক

iii. এটিই বাঙালির প্রথম সাহিত্য কর্ম ছিল

২০২০

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬ ও ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

মনু মাঝি নৌকা বাইছে। নতুন ধানে ভরা তার নৌকা। মনের সুখে গলা ছেড়ে গাইছে বাংলার চির পরিচিত একটি গান।

'মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে
আমি আর বাইতে পারলাম না।'

৬. **মনু মাঝি কোন ধরনের গান গাইছেন ?**

ক. মুর্শিদি খ. ভাওয়াইয়া

গ. বারমাস্যা ঘ. বাউল

৭. **মনু মাঝির গানের মধ্যে কোনটি বেশি প্রকাশ পেয়েছে ?**

ক. আধ্যাত্মিক সাধনা খ. নৈসর্গিক অবস্থা

গ. নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ঘ. সাহিত্য শিল্পের চর্চা

সৃজনশীল

১. আজমল সাহেব ০৫ বছর পর কাতার থেকে দেশে ফিরে তার ছেলে- মেয়েদের পরিবর্তন দেখে বিস্মিত হলেন। তার মেয়ে ইন্টারনেট থেকে ঘরে বসেই নতুন নতুন তথ্য ও দেশ-বিদেশের খবর জানছে। ছেলে ফেসবুকে বন্ধুদের সাথে যোগাযোগের পাশাপাশি অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও সংগ্রহ করছে। তার ছোট ভাই বিদেশ থেকে অনলাইনে টাকা পাঠাচ্ছে। বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের জীবনযাপনেও পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে।

ক. সামাজিক উন্নয়ন কী?

খ. অন্য সংস্কৃতি ধারা নিজ সংস্কৃতিতে আয়ত্ত করাকে কী বলে? ব্যাখ্যা কর।

গ. আজমল সাহেবের পরিবারে কী ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের বৈচিত্র্যগুলো সমাজ পরিবর্তনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে–এর স্বপক্ষে তোমার যুক্তি দাও।

২০২১

২।

	শিল্প উপাদান			
ক	পোড়ামাটির শিল্প	তালপাতার শিল্প	নকশিকাঁথা	কষ্টিপাথর
খ	চর্যাগীতি, কীর্তনগান	মঙ্গলকাব্য	পুঁথিসাহিত্য	গদ্যসাহিত্য

ক. চর্যাপদের কাল নির্ণয় করেন কে?

খ. সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ কেন ঘটে?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' শিল্পটির ধরন ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "বাঙালির সংস্কৃতির বিকাশে 'খ' শিল্পটির গুরুত্ব অপরিসীম"-বিশ্লেষণ কর।

৩.

চিত্র : বাঙালির সংস্কৃতি ও শিল্পকলার নিদর্শন

ক. টেরাকোটা কী ?

খ. পাল যুগে তালপাতায় আঁকা ছবিগুলো এখনও ঝকঝকে রয়েছে কেন ?

গ. উদ্দীপকে বাংলার কোন শিল্পের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? বর্ণনা কর।

ঘ. উদ্দীপকের শিল্পকর্ম এখনও টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বাংলার নারীদের অবদান মূল্যায়ন কর।

চতুর্থ অধ্যায়

ঔপনিবেশিক যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য

বাংলাদেশে প্রায় দুইশত বছরের ইংরেজ শাসনামলই (১৭৫৭-১৯৪৭) ঔপনিবেশিক যুগ হিসাবে পরিচিত। ইংরেজ আমলে বাংলাদেশে অনেক জমিদার বাড়ি, বণিকদের আবাসিক ভবন, অফিস আদালত ভবন, রেলস্টেশন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য স্থাপত্য তৈরি হয়েছিল। 'প্রত্ন' শব্দের অর্থ হলো পুরনো। প্রত্নসম্পদ বলতে পুরনো স্থাপত্য ও শিল্পকর্ম, মূর্তি বা ভাস্কর্য, অলঙ্কার, প্রাচীন আমলের মুদ্রা ইত্যাদিকে বোঝায়। এসব প্রত্ননিদর্শনের মধ্য দিয়ে সেকালের মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা, জীবনযাত্রা, বিশ্বাস-সংস্কার, রুচি বা দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- ঢাকা শহরে ঔপনিবেশিক যুগে নির্মিত ধর্মীয় স্থাপত্যগুলোর বিবরণ দিতে পারব;
- ঢাকা শহরের কোন কোন অংশে ধর্মীয় ইমারত নির্মিত হয়েছে তা বর্ণনা করতে পারব;
- ঔপনিবেশিক যুগে ঢাকায় নির্মিত উল্লেখযোগ্য লৌকিক ইমারতসমূহের বর্ণনা দিতে পারব;
- কোন কোন ইমারত সরকারিভাবে আর কোনগুলো বেসরকারিভাবে নির্মিত হয়েছে তা উল্লেখ করতে পারব;
- ঢাকার বাইরে কোন কোন অঞ্চলে জমিদাররা প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন তা বর্ণনা করতে পারব;
- ঢাকার বাইরে জমিদারদের তৈরি মন্দির সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- প্রত্ননিদর্শনের আলোকে ঔপনিবেশিক যুগে সোনারগাঁওয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পানামনগর ও সরদার বাড়ির বর্ণনা করতে পারব;
- ঔপনিবেশিক যুগের প্রত্ননিদর্শন কোন কোন জাদুঘর ও সংগ্রহ শালায় রয়েছে তা বর্ণনা করতে পারব;
- জাদুঘরে সংগৃহীত নিদর্শনগুলো সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- প্রত্নস্থান ও প্রত্নসম্পদের প্রতি আগ্রহ তৈরি হবে এবং এসব সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ-১ : ঢাকা শহরের প্রত্ননিদর্শন

ঔপনিবেশিক যুগের ঢাকার স্থাপত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি মসজিদ, মন্দির ও গির্জা। ঢাকার মসজিদগুলো মোগল স্থাপত্য রীতিতে তৈরি। তবে এর সঙ্গে কিছুটা ইউরোপীয় রীতিও যোগ হয়েছে। উনিশ শতকে তৈরি ঢাকার উল্লেখযোগ্য মসজিদের মধ্যে রয়েছে লালবাগ (হরনাথ ঘোষ রোড) মসজিদ, লক্ষ্মীবাজার মসজিদ, সূত্রাপুরের কলুটোলা জামে মসজিদ, বেচারাম দেউড়ি মসজিদ, কায়েতটুলি মসজিদ এবং সূত্রাপুরের সিতারা বেগম মসজিদ। এগুলোর নির্মাণকলা ও বিচিত্র কারুকাজ চিত্তাকর্ষক। লক্ষ্মীবাজারের চিনি টিকরি মসজিদও স্থাপত্যশিল্পের চমৎকার নিদর্শন। ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত শিয়াদের ইমামবাড়া, হোসেনি দালান ইংরেজ আমলে নতুন করে নির্মিত হয়।

ঢাকা শহরের বিখ্যাত ঢাকেশ্বরী মন্দির ও রমনা কালীমন্দির ঔপনিবেশিক যুগের আগে তৈরি। রমনার কালী মন্দিরটি অবশ্য ঔপনিবেশিক আমলে আবার নতুন করে নির্মিত হয়েছিল।

২০২০

আঠারো-উনিশ শতকে ঢাকা শহরে তৈরি হয় বেশ কয়েকটি গির্জা। এর মধ্যে সবচেয়ে পুরনো হলো আর্মেনিয়ান গির্জা। এটি তৈরি হয় আরমানিটোলায় ১৭৮১ সালে। উনিশ শতকে ঢাকায় নির্মিত হয় সেন্ট টমাস এ্যাংলিকান গির্জা ও হলিক্রস গির্জা। এছাড়াও ঢাকার পুরনো স্থাপত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে সদরঘাট এলাকায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে অবস্থিত বাহাদুর শাহ পার্ক। উনিশ শতকের মাঝামাঝি ঢাকার নওয়াব আবদুল গণি এ পার্ক তৈরি করে ব্রিটেনের রাণী ভিক্টোরিয়ার নামে এর নাম দেন ভিক্টোরিয়া পার্ক। তার আগে এ জায়গাটির নাম ছিল আন্টাঘর ময়দান। আন্টাঘর ময়দানের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ১৮৫৭ সালের প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস। ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর এদেশীয় সৈন্যরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করেন। ইংরেজরা একে বলে সিপাহি বিদ্রোহ। যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যরা জিততে পারেন নি। বিদ্রোহী সৈন্যদের যাঁরা ঢাকায় ইংরেজদের হাতে বন্দি হন তাঁদের ইংরেজরা এই আন্টাঘর ময়দানে গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেয়। এই ঘটনার ঠিক একশো বছর পর ১৯৫৭ সালে স্বাধীনতার জন্য জীবনদানকারী সৈনিকদের স্মৃতিতে এখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়। ভারতবর্ষের শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের নামে পার্কটির নাম হয় বাহাদুর শাহ পার্ক।

কার্জন হল

ঢাকার প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তির আরেকটি বিখ্যাত নিদর্শন বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ঢাকার নওয়াবদের তৈরি প্রাসাদ আহসান মঞ্জিল। এছাড়া জমিদার ও বণিকদের তৈরি পুরনো ঢাকার রূপলাল হাউস এবং রোজ গার্ডেনও চমৎকার স্থাপত্যকর্ম। অফিস বাড়ি হিসাবে ঢাকায় যেসব ভবন তৈরি হয়েছিল তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে কার্জন হল। ইংরেজ আমলে তৈরি এ ভবনটি বহুকাল ধরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের অংশ। পুরনো হাইকোর্ট ভবনটিও ইংরেজ আমলে তৈরি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের চত্বরে অবস্থিত গ্রিক সমাধিসৌধটি ১৯১৫ সালে নির্মিত। বর্গাকার ও সমতল ছাদযুক্ত এ স্থাপত্যে প্রাচীন গ্রিসের 'ডরিক রীতি' অনুসৃত হয়েছে।

কাজ : ঢাকা শহরের কয়েকটি প্রধান প্রত্ননিদর্শনের নাম উল্লেখ কর।

২০১৮

পাঠ-২ : ঢাকার বাইরের প্রত্নুনিদর্শন

সুলতানি আমলে বাংলার রাজধানী ছিল সোনারগাঁও। পরবর্তীকালে মোগল যুগে এর গুরুত্ব কমে যায়। কিন্তু তখনো মসলিন শাড়ির উৎপাদন ও ব্যবসাকেন্দ্র হিসাবে এর খ্যাতি ছিল। উনিশ শতকে ধনী ব্যবসায়ীদের অনেকে বসবাসের জন্য সোনাগাঁওয়ের পানাম এলাকাটি বেছে নেন। এরা পানামের মূল সড়কের দুইপাশে সারিবদ্ধভাবে অনেক ঘরবাড়ি নির্মাণ করেন। পানামনগরে এখনও এ রকম ৫২টি ইমারত টিকে আছে। চওড়া পথের দুই পাশে ইমারতগুলো সুন্দরভাবে সাজানো। পথের উত্তর পাশে ৩১টি এবং দক্ষিণ পাশে রয়েছে ২১টি ইমারত। এর মধ্যে কয়েকটি বর্তমানে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। এলাকার নিরাপত্তার জন্য পানামের অধিবাসীরা ইমারতগুলোর চারপাশ ঘিরে পরিখা খনন করেছিল। ব্রিটিশ আমলে নির্মিত এই ভবনগুলোতে ইউরোপীয় স্থাপত্য রীতি অনুসরণ করা হয়। তবে এদের নির্মাণকলায় মোগল স্থাপত্যেরও প্রভাব আছে। অনেক অট্টালিকা সাজানো হয়েছিল রঙিন মোজাইকে।

পানাম নগর

পানামের আশেপাশে আরও কয়েকটি চমৎকার ইমারত এখনও টিকে আছে। এগুলো তৈরি করেছিলেন স্থানীয় জমিদার ও ব্যবসায়ীরা। এগুলোর মধ্যে সরদারবাড়ি, আনন্দমোহন পোদ্দারের বাড়ি ও হাসিময় সেনের বাড়ি উল্লেখযোগ্য।

সরদারবাড়ি বা বড় সরদারবাড়িতে এখন স্থাপিত হয়েছে লোকশিল্প জাদুঘর। এ বাড়ির নির্মাণকাল ১৯০১ সাল। এটি তৈরি হয়েছে দুইটি বড় প্রাসাদকে নিয়ে। একটি করিডোর বা লম্বা বারান্দা দিয়ে প্রাসাদ দুইটি একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। দোতলা এই বাড়িতে রয়েছে ৭০টি কক্ষ। রঙিন মোজাইকের নানা কারুকাজে শোভিত হয়েছে সরদারবাড়ি।

সরদারবাড়ি

সোনারগাঁওয়ের বাইরেও বাংলাদেশের নানা জায়গায় জমিদারদের তৈরি কিছু অনুপম সুন্দর প্রাসাদ ও স্থাপত্য নিদর্শন রয়েছে। যার মধ্যে ময়মনসিংহের শশীলজ একটি। মুক্তাগাছার জমিদাররা এটি তৈরি করেছিলেন। মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ার বালিয়াটির জমিদারবাড়িও সেরকম আরেকটি চমৎকার স্থাপত্যকর্মের নিদর্শন। রংপুরের তাজহাট জমিদার বাড়িও বেশ বিখ্যাত। নাটোরের দিঘাপতিয়ার জমিদারের প্রাসাদও তার চমৎকার স্থাপত্যকর্মের জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এটি এখন উত্তরা গণভবন নামে পরিচিত। তাজহাট ও নাটোরের দুইটি প্রাসাদই বর্তমানে স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শন হিসাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

কাজ : ঢাকার বাইরের কয়েকটি স্থাপত্যকীর্তি উল্লেখ কর।

পাঠ-৩ : জাদুঘরে সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ

বাংলাদেশের পুরাকীর্তিগুলো থেকে পাওয়া অনেক প্রত্ননিদর্শন জাদুঘরে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা হয়। এসব প্রত্নসম্পদ দেখে দেশের পুরনো ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। ঢাকায় রয়েছে আমাদের জাতীয় জাদুঘর। এছাড়া নানা প্রত্নস্থলের জাদুঘরেও রয়েছে প্রচুর প্রত্নসম্পদ। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারিতে সারা দেশে প্রত্ননিদর্শনের সঙ্গে প্রদর্শন করা হয়েছে বাংলার নবাব, জমিদার ও ইংরেজ শাসনকালের বেশ কিছু প্রত্নসম্পদ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দিনাজপুরের মহারাজার ব্যবহার করা দ্রব্য ও হাতির দাঁতের কারুকাজ করা শিল্পদ্রব্য। বলধার জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরীর সংগ্রহ থেকে আনা পোশাক, হাতির দাঁতের নানা কারুকাজ করা দ্রব্য ও ঢাল-তলোয়ার। এছাড়া এখানে রাখা হয়েছে নাটোরের দিঘাপতিয়ার জমিদারদের ব্যবহার করা দ্রব্য, পোশাক, ঢাল-তলোয়ার ও সিংহাসন এবং ঢাকার নওয়াবদের ব্যবহার করা কারুকার্যখচিত পোশাক ও জিনিসপত্র।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

কোনো কোনো আঞ্চলিক জাদুঘর ও সংগ্রহশালায় নানা প্রত্নানিদর্শন প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছে। অধিকাংশ সংগ্রহশালাই জমিদারদের পুরনো প্রাসাদে অবস্থিত। জমিদারদের ব্যবহার করা নানা দ্রব্য এবং তাদের সংগ্রহ করা নানা প্রত্নসম্পদ সেখানে প্রদর্শন করা হয়।

বর্তমানে ঢাকার আহসান মঞ্জিল একটি জাদুঘর। আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে ঢাকার নওয়াবদের পোশাক, খাট-পালঙ্ক, চেয়ার, সোফা, অলঙ্কার ও আলোকচিত্র স্থান পেয়েছে। ময়মনসিংহ শহরে জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। বৃহত্তর ময়মনসিংহের জমিদারদের ব্যবহার করা জিনিসপত্রই এখানে স্থান পেয়েছে বেশি।

মুক্তাগাছার জমিদারদের প্রত্নসম্পদ ময়মনসিংহ জাদুঘরে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পাথরের ফুলদানি, কম্পাস, ঘড়ি, অলঙ্কার, মৃৎপাত্র, কাপড়বোনার যন্ত্র, লোহার সিন্দুক, খেলার সরঞ্জাম, সরস্বতী ও বিষ্ণুমূর্তি, বাঘ, ড্রাগন, বন্য ষাঁড় ও হরিণের মাথা, সোফাসেট ও ইটালিতে তৈরি মূর্তি ইত্যাদি।

বর্তমানে রংপুরের তাজহাট জমিদারদের প্রাসাদও একটি জাদুঘর। এখানে উত্তরবঙ্গের প্রত্ননিদর্শনের সঙ্গে তাজহাট জমিদারদের ব্যবহার করা দ্রব্যসামগ্রী, সংস্কৃত ও আরবি ভাষায় লেখা পাণ্ডুলিপি স্থান পেয়েছে।

কুষ্টিয়ার শিলাইদহে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়িতে স্থান পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিজড়ানো নানা নিদর্শন এবং আলোকচিত্র।

কাজ : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত প্রত্ননিদর্শনগুলোর তালিকা তৈরি কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক যুগ ছিল কোনটি ?

ক. ১৭৫৭-১৮৫৭ খ. ১৭৮১-১৮৫৭

গ. ১৭৫৭-১৯৪৭ ঘ. ১৮৫৭-১৯৫৭

২. সোনারগাঁও এর পানাম নগরটি ছিল–

i. সুলতানি আমলে বাংলার কেন্দ্রস্থল

ii. ইউরোপীয় স্থাপত্য রীতিতে তৈরি ইমারতের সারিবদ্ধ রূপ

iii. চওড়াপথের ধারে নিরাপত্তার জন্য পরিখাসমৃদ্ধ ২০২০

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i	খ. ii
গ. i ও ii	ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হলে শিক্ষক আজাদ রহমান শিক্ষার্থীদের নিয়ে শাহবাগে একটি ভবন পরিদর্শনে যান। ভবনটিতে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীরা বইয়ে পড়া প্রাচীন নিদর্শনগুলো বাস্তবে দেখে খুবই অভিভূত হয়।

৩. আজাদ সাহেব শিক্ষার্থীদের কোন ভবন পরিদর্শনে নিয়ে যান ?

ক. বাংলা একাডেমি	খ. জাতীয় গ্রন্থাগার
গ. শিল্পকলা একাডেমি	ঘ. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

৪. আজাদ সাহেবের শিক্ষার্থীদেরকে এ ধরনের ভবন পরিদর্শনে নেওয়ার কারণ হলো–

i. জমিদারদের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি প্রদর্শন

ii. ইতিহাসের চরিত্রগুলোর সাথে পরিচিত করানো

iii. বিভিন্ন আমলের ঐতিহ্যকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i	খ. i ও iii
গ. ii ও iii	ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অর্নব ও অর্পা ঈদের ছুটিতে মামাবাড়ি বেড়াতে গেল। তারা মামার কাছে স্থানীয় বিখ্যাত নিদর্শনগুলো দেখার বায়না ধরল। মামা তাদেরকে মসলিনের জন্য বিখ্যাত স্থানটি ঘুরতে নিয়ে গেলেন। তারা সেখানকার প্রাচীন বিভিন্ন ইমারতের স্থাপত্য ও নকশা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। মামা তাদেরকে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন স্থান হতে প্রাপ্ত পুরাকীর্তিগুলির নিদর্শন দেখাতে নিয়ে যান যাতে তারা অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারে।

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি কোথায় অবস্থিত?

খ. প্রত্নতত্ত্ব বলতে কী বোঝায়?

গ. তারা যে স্থানটি পরিদর্শন করে সেটির ঐতিহ্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মামা তাদের কোথায় নিলে তারা ঐতিহ্য সচেতন হতে পারবে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামতসহ ব্যাখ্যা কর।

২০২০

পঞ্চম অধ্যায়

সামাজিকীকরণ ও উন্নয়ন

সামাজিকীকরণ মানুষের জীবনব্যাপী একটি চলমান প্রক্রিয়া। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজ জীবনের কাঙ্ক্ষিত আচরণ উপযোগী হয়ে গড়ে উঠে। এ প্রক্রিয়ায় সমাজের নিয়ম-নীতি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আদর্শ ইত্যাদি আয়ত্ত করে ব্যক্তি যেমন নিজের উন্নয়ন ঘটায় তেমনি সমাজ উন্নয়নেও অংশগ্রহণ করে। তোমরা ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে সামাজিকীকরণ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করেছ। এ অধ্যায়ে শিশুর সামাজিকীকরণে কতিপয় উপাদানের প্রভাব, বাংলাদেশে গ্রাম ও শহরের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া এবং সামাজিকীকরণে বিশ্বায়নের প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হবে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- সামাজিকীকরণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও উপাদানের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া তুলনা করতে পারব ;
- সামাজিকীকরণে গণমাধ্যম ও তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করা ও এর ইতিবাচক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হব ;
- সামাজিকীকরণে বিশ্বায়নের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব এবং এ সম্পর্কে বাস্তব তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপন করতে পারব ;
- মানবিক ও সামাজিক গুণাবলি রপ্ত করে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের যোগ্যতা অর্জন করব এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ আচরণে উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ- ১ : সামাজিকীকরণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রভাব

ব্যক্তির সুষ্ঠু বিকাশের জন্য সামাজিকীকরণ প্রয়োজন। জন্মের পর থেকেই মানব শিশু সমাজের নিয়ম-কানুন ও রীতিনীতি শিখতে থাকে। একেই বলা যায় তার সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া। এই অধ্যায়ে আমরা সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে কয়েকটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সম্পর্কে জানব।

পরিবার : সামাজিকীকরণের প্রথম ও প্রধান বাহন পরিবার। পরিবারে বসবাস করতে গিয়ে শিশু পরিবারের সদস্যদের প্রতি আবেগ, অনুভূতি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জাগিয়ে তোলে। খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, ধর্মচর্চা, শিক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে পারিবারিক সংস্কৃতির প্রতিফলন সরাসরি ব্যক্তির উপর পড়ে। এজন্যেই বলা হয় সামাজিকীকরণের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বাহন হচ্ছে পরিবার।

স্থানীয় সমাজ : মা-বাবা বা পরিবারের পর স্থানীয় সমাজই শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চারপাশের মানুষের আচার-আচরণ ও রীতিনীতি দেখতে দেখতে ২০২০

শিশু বেড়ে উঠে। এভাবে সে সহজেই সমাজের রীতিনীতি শিখে যায়। স্থানীয় মানুষের ভাষা, আচার-আচরণ ও মূল্যবোধ তার আচরণে প্রভাব ফেলে।

স্থানীয় সমাজের বিভিন্ন উপাদান : স্থানীয় সমাজের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য, সমিতি, সাংস্কৃতিক সংঘ, খেলাধুলার ক্লাব, সংগীত শিক্ষা কেন্দ্র, বিজ্ঞান ক্লাব প্রভৃতি। স্থানীয়ভাবে গড়ে উঠা এসব সংগঠন ব্যক্তির চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচার-আচরণের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। ব্যক্তি এসব সংগঠনের সঙ্গে নিজেকে জড়ায়। সংগঠনভুক্ত অন্যদের সঙ্গে মিশে তার বুদ্ধিবৃত্তি, সুকুমার বৃত্তি ও সৌন্দর্যবোধ জেগে উঠে। এই বোধ তাকে সহনশীল হতে শেখায়। এভাবেই ব্যক্তি স্থানীয় সমাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ায় এবং তাদের অংশ হয়ে উঠে।

সমবয়সী সঙ্গী : শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সমবয়সী বন্ধু বা সঙ্গীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শৈশবে সমবয়সীদের সঙ্গে খেলাধুলার আকর্ষণ থাকে অপ্রতিরোধ্য। এভাবে খেলার সাথিরা একে অপরের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখে। কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও চালচলনের ক্ষেত্রে তারা একে অন্যকে প্রভাবিত করে। এর মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে সহমর্মিতা, সহযোগিতা, সহনশীলতা ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পরস্পরের সাথে মিলিত হওয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ পায়। এর মাধ্যমে একে অপরকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান : রাজনৈতিক দল, নেতৃত্ব এবং আন্দোলন-সংগ্রামও ব্যক্তির সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মানুষকে সচেতন ও সংগঠিত করার মাধ্যমে তারা এ কাজটি করে।

কাজ : সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা উল্লেখ কর।

পাঠ- ২ : সামাজিকীকরণে বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব

কাঙ্ক্ষিত ও সুস্থ জীবনের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমাজের কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি, আদর্শ, অভ্যাস আয়ত্ত করতে হয়। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি এগুলো আয়ত্ত করে। এগুলো আয়ত্ত করার পিছনে অনেক উপাদান কাজ করে। এই উপাদানগুলো হলো: অনুকরণ, অভিভাবন, অঙ্গীভূতকরণ ও ভাষা।

অনুকরণ : যখন একজন অপরজনের কাজ ও আচার-আচরণ হুবহু নকল করে তখন তাকে অনুকরণ বলে। শিশুরা সবসময়ই বড়দের অনুকরণ করে। অনুকরণের মাধ্যমে শিশু ভাষা, উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গি ইত্যাদি আয়ত্ত করে থাকে। বড়রাও অনেক সময় অন্যকে অনুকরণের মাধ্যমে নতুন বা অচেনা পরিবেশের উপযোগী করে নিজেকে খাপ খাওয়ায়।

২০২০

অভিভাবন : অভিভাবন এক ধরনের যোগাযোগ মাধ্যম বা প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রস্তাব বা তথ্যাদি অপরের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। শিশুদের মধ্যে যুক্তি বা জ্ঞানের পরিপক্কতা থাকে না, তাই তারা সহজে অভিভাবিত হয়ে যায়। অভিভাবন প্রক্রিয়ার প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। যেমন- শিক্ষা, রাজনীতি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি। অভিভাবন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চেষ্টা করা হয় নিজের ধ্যান-ধারণাকে অপরের মধ্যে প্রবিষ্ঠ করানোর এবং অন্যের আচার-আচরণ ও কাজ কর্মকে নিজের অভিপ্রায় অনুসারে পরিচালিত করার। সাম্প্রতিককালে সমাজব্যবস্থায় প্রচার কার্য ও বিজ্ঞাপনের ব্যাপক উদ্যোগ অভিভাবনের মনস্তাত্ত্বিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

অঙ্গীভূতকরণ : শিশু শৈশবে সচেতনভাবে বা সজ্ঞানে কিছুই করে না। শৈশব অবস্থায় সে সব কিছু এলোমেলোভাবে করে। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে কোন জিনিস তার প্রয়োজন তা সে বুঝতে পারে এবং এই জিনিসগুলো তার অঙ্গীভূতকরণের বিষয়ে পরিণত হয়। এইভাবে শিশু অঙ্গীভুত করে নেয় বিভিন্ন খেলনা, ছবি ও ছড়ার বই প্রভৃতি যা তার বিনোদনে কাজে লাগে। এছাড়া মা-বাবা ও অন্যদের যারা তার ভালোমন্দের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে তাদেরকেও অঙ্গীভূত করে নেয়। শিশুরা তার পছন্দমতো নিজেকে সাজাতে ভালোবাসে। যেমন নিজেকে স্পাইডারম্যান সাজিয়ে সবাইকে চমকে দিতে পছন্দ করে। এটি শিশুর এক ধরনের বিনোদন। অঙ্গীভূতকরণের এই প্রক্রিয়া ও প্রবণতার পরিধি ক্রমশ প্রসারিত হতে থাকে এবং সমাজবদ্ধ মানুষ সামাজিক প্রকৃতি অর্জন করে।

ভাষা : মানুষের যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম ভাষা। সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় ভাষার মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়। ভাষার মাধ্যমে ব্যক্তি তার মনের ভাব প্রকাশ করে। তাছাড়া একে অন্যকে জানা কিংবা নিজের দেশ ও সমাজ এবং বহির্জগত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন, শিক্ষা গ্রহণ সবই চলে ভাষার মাধ্যমে। বস্তুত ভাষা শৈশব থেকে ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে।

কাজ :	সামাজিকীকরণে ভাষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

পাঠ- ৩ : বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

বাংলাদেশের প্রায় ৮৫% লোক গ্রামে বাস করলেও গ্রাম ও শহর নিয়েই বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা। এদেশের অধিকাংশ মানুষের সামাজিকীকরণ হয় গ্রামীণ পরিবেশে। তবে শহরের সমাজ কাঠামো আলাদা হওয়ায় সেখানকার সামাজিকীকরণের ধরন গ্রামের থেকে একটু আলাদা। গ্রাম ও শহরের পরিবার কাঠামোর পার্থক্যের কারণে শিশুর সামাজিকীকরণও ভিন্ন হয়।

গ্রামের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া : গ্রামীণ পরিবেশে শিশু নিজ পরিবারসহ অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের মাঝে বেড়ে উঠে। এতে পরিবারের সদস্যদের আচার-আচরণের সাথে শিশুর আচরণের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে। এর মাধ্যমে শিশু সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা, শ্রদ্ধাবোধ প্রভৃতি গুণাবলি অর্জন করে। কিন্তু শহরের অধিকাংশ শিশু বেড়ে উঠে একক পরিবারে। যার ফলে অনেক সময় শিশুদের আচরণে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক আচরণ গড়ে উঠে না। গ্রামের মানুষের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ পরিবার, পাড়া-প্রতিবেশী, জাতিগোষ্ঠী, সমবয়সী দল ও খেলার সাথি, কর্মক্ষেত্র, স্ব স্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি ব্যক্তির সামাজিকীকরণে ভূমিকা রাখে। এছাড়া লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান যেমন- উৎসব, পালাগান, লোক নাটক, লোক সংগীত, যাত্রা, পুতুল নাচ, লৌকিক আচার প্রভৃতির মাধ্যমেও গ্রামে সামাজিকীকরণ ঘটে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সামাজিকীকরণের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। তবে ইদানীং টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, ইন্টারনেট ইত্যাদিও সক্রিয় ভূমিকা রাখছে।

শহরে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া : শহরের মানুষের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় পরিবারই সবচেয়ে প্রথম ও প্রধান মাধ্যম। পরিবারই হচ্ছে শিশুর শিক্ষার প্রথম মাধ্যম। পরিবারের পর সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যম। শহরের অধিকাংশ মানুষ উন্নয়নমুখী। শহরের মানুষের সামাজিকীকরণে কর্মক্ষেত্র, বিনোদনমূলক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সভা-সমিতি, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শহরে গণমাধ্যম সামাজিকীকরণে শক্তিশালী ভূমিকা রাখে। মানুষ বিশ্বের বহু তথ্য গণমাধ্যমের মাধ্যমে পেয়ে থাকে। ফলে শহরের মানুষ সমকালীন সমাজ ও বহির্বিশ্বের নিত্য নতুন তথ্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সহজে গ্রহণ করে এবং দ্রুত নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে।

সামাজিকীকরণে প্রতিবেশীর ভূমিকা গ্রাম ও শহর উভয় সমাজেই ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। গ্রামীণ সমাজে প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠ হয় শহরের ক্ষেত্রে ততটা হয় না। তবে শহরের শিশুরা খেলাধুলা কিংবা আনন্দ উৎসবে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে অনেক সময় একে অন্যের আপন হয়ে যায়। শিশু-কিশোররা প্রতিবেশীর গণ্ডিতে থাকলে সহজে সমাজ স্বীকৃত আচরণ শিখে। ভালো কাজের প্রশংসা ও খারাপ কাজের সমালোচনা তাদেরকে সমাজ স্বীকৃত আচরণ করতে উৎসাহিত করে। এভাবে বিদ্যালয়, গণমাধ্যম, স্থানীয় খেলাধুলা ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রাম ও শহরের শিশু-কিশোরদের সামাজিকীকরণ ঘটে থাকে।

কাজ : গ্রাম ও শহরের সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা বর্ণনা কর।

২০২০

পাঠ- ৪ : ব্যক্তির সামাজিকীকরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা

জনগণের কাছে সংবাদ, মতামত ও বিনোদন পরিবেশন করা হয় যেসব মাধ্যমে তাকেই বলা হয় গণমাধ্যম। যেমন- সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র। আর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলতে বোঝায় সেই প্রযুক্তি যার সাহায্যে তথ্য সংরক্ষণ ও তা ব্যবহার করা যায়। যেমন, ইন্টারনেট, ফোন প্রভৃতি। গণমাধ্যম এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যক্তির সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আজকের দিনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এর গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে।

সংবাদপত্র : সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে সংবাদপত্র জনশিক্ষার একটি প্রধান মাধ্যম। আপন সমাজ ও বিশ্ব সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে তা মানুষের মনের সংকীর্ণতা দূর করে। তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহনশীলতা, সহমর্মিতা ও বিশ্বজনীনতার বোধ সৃষ্টি করে।

বেতার বা রেডিও : বেতার কেবল সংবাদই পরিবেশন করে না, শিক্ষা ও বিনোদনমূলক নানা অনুষ্ঠানও প্রচার করে। এর ফলে গণসচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের মধ্যে সংস্কৃতিবোধ সৃষ্টি হয়।

টেলিভিশন : আজকের দিনে সারা পৃথিবীতেই টেলিভিশন সবচেয়ে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় গণমাধ্যম। মানুষের চিন্তাভাবনা ও জীবনযাপনকে এটি নানাভাবে প্রভাবিত করে। টেলিভিশন বিনোদন এবং তথ্য ও শিক্ষামূলক নানা ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার করে নাগরিকদের আনন্দ ও শিক্ষা দেয়। সাধারণ মানুষ বিশেষ করে শিশু- কিশোরদের উপর টেলিভিশনের প্রভাব খুব বেশি। এই প্রভাব ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই রকমই হতে পারে। টেলিভিশনে যদি বেশি করে আকর্ষণীয় শিক্ষা ও তথ্যমূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় তবে তা মানুষকে আলোকিত করে তুলতে পারে। আপন দেশ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে নবীন প্রজন্মের মানুষকে পরিচিত করে তোলার মাধ্যমে টেলিভিশন তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলতে পারে। এর ফলে সামাজিকীকরণের কাজটি সহজ হয়। অন্যদিকে টেলিভিশনের সস্তা বিনোদনমূলক বা রুচিহীন অনুষ্ঠান সমাজের বিশেষ করে শিশু-কিশোর মনের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। তারা অসুস্থ ও বিকৃত মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠে। অতিরিক্ত বা রাত জেগে টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখার ফলে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার ক্ষতি হয়।

চলচ্চিত্র : সুস্থ, রুচিশীল ও শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র মানুষকে আনন্দ দেওয়ার পাশাপাশি তাদের মধ্যে মূল্যবোধ, মানবিকতা ও সহমর্মিতার বোধ জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে সামাজিকীকরণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। উল্টোদিকে অশ্লীল ও রুচিহীন চলচ্চিত্র সমাজের মানুষের মূল্যবোধ ও রুচির অবনতি ঘটায়। সমাজের উপর যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। সামাজিকীকরণে সহায়তা করার পরিবর্তে তা সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং অপরাধ প্রবণতা ও বিশৃঙ্খলার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

২০২০

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব : ইন্টারনেট প্রযুক্তি বর্তমানে দেশ বা দেশের বাইরে এক জনের সঙ্গে অন্যজনের যোগাযোগকে খুবই সহজ করে দিয়েছে। আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ভাববিনিময়, পরস্পরের খোঁজখবর নেওয়া কিংবা ব্যবসায়িক প্রতিপক্ষের সঙ্গে পণ্যবিনিময় সংক্রান্ত আলোচনা, চুক্তি ইত্যাদি এখন ঘরে বসে অল্প সময়েই করা যায়। কিছুদিন আগেও যা ভাবা যেত না। এভাবে ব্যক্তির সামাজিকীকরণের মাধ্যমে সমাজের উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ইলেক্ট্রনিক মেইল : ই-মেইলের সঙ্গে আমরা সবাই আজকাল পরিচিত। ই-মেইল হচ্ছে ইলেক্ট্রনিক মেইল এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এর মাধ্যমে খুব অল্প সময়ে ও কম খরচে দেশে-বিদেশে চিঠি ও তথ্য আদান-প্রদান করা যায়। ই-মেইল পৃথিবীব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যুগান্তরকারী পরিবর্তন এনেছে। ব্যক্তির সামাজিকীকরণের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে বর্তমানে ই-মেইলের কোনো বিকল্প নেই।

ইলেক্ট্রনিক কমার্স : ইলেক্ট্রনিক কমার্সকে সংক্ষেপে বলে ই-কমার্স। এ পদ্ধতিতে অনলাইনে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে পণ্য লেন-দেন করা যায়।

ফেসবুক ও টুইটার : ফেসবুক ও টুইটারের সাহায্যে খুব সহজে দেশে বা বিদেশে যে কোনো মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি এবং মতামত ও ছবি বিনিময় করা যায়। আধুনিক বিশ্বে এটি সামাজিক যোগাযোগের একটি কার্যকর মাধ্যম হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। আর দিন দিন এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তবে বিজ্ঞানের অন্য অনেক আবিষ্কারের মতো ইন্টারনেট, ফেসবুক ও টুইটারেরও কিছু মন্দ বা নেতিবাচক দিক আছে। মানুষের হাতে এগুলোর অপব্যবহার ব্যক্তি ও সমাজ দুইয়ের জন্যই মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। আজকাল প্রায়ই তরুণ সমাজের উপর ইন্টারনেট ও ফেসবুকের নেতিবাচক প্রভাবের কথা শোনা যায়। এ বিষয়ে আমাদের অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে।

কাজ- ১ : শিশুর সামাজিকীকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা উল্লেখ কর।

কাজ- ২ : ব্যক্তির সামাজিকীকরণে ই-মেইলের প্রভাব উল্লেখ কর।

পাঠ-৫ : বিশ্বায়ন ও সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম পৃথিবীর একদেশ থেকে অন্যদেশের দূরত্ব কমিয়ে এনেছে। তাই বিভিন্ন দেশের সমাজ ও সংস্কৃতি আমাদের জীবনের উপর প্রভাব ফেলছে। আর এটাই হচ্ছে বিশ্বায়ন। বিশ্বায়নের ফলে সারা বিশ্ব এখন বিশ্বপল্লিতে রূপান্তরিত হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং তথ্য প্রযুক্তির প্রসারে মানুষ এখন নিজ সমাজ ও সংস্কৃতির মাঝে সীমাবদ্ধ নেই। মানুষ এখন বিশ্ব নাগরিক। কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য পৃথিবীর একদেশ থেকে অন্যদেশে ছুটে বেড়ায় এবং তথ্য সংগ্রহ করে। তাই তাকে বিশ্ব সমাজ সম্পর্কে জানতে হয়। একই কারণে মানুষকে তার নিজ সমাজ ও সংস্কৃতির পাশাপাশি অন্য সমাজ ও সংস্কৃতির সাথেও খাপ খাইয়ে চলতে হয়। বিশ্বায়ন ও সামাজিকীকরণ তাই পাশাপাশি চলে।

শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের প্রভাব অনেক। বিশেষ করে বৈশ্বিক সামাজিকীকরণের ফলে আমরা এখন বিশ্ব সমাজের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছি। আমরা বিশ্বের বহু দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে পারস্পরিক ভাব-বিনিময় করছি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে একে অন্যের সহযোগিতা পাচ্ছি। আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে স্বীকৃত ইংরেজি ভাষা জানা থাকলে এখন ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে বিশ্বের সকলের কাছাকাছি যাওয়া যায়। গণমাধ্যম ও তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষ আজ ঘরে বসেই পৃথিবীর নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারছে। প্রত্যেকে নিজেকে একজন বিশ্ব নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলে নিজের ও সমাজের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হচ্ছে। তাই ব্যক্তির সামাজিকীকরণে বিশ্বায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে। যা মানুষের জীবনকে পাল্টে দিচ্ছে।

কাজ : সামাজিকীকরণে বিশ্বায়নের প্রভাব বর্ণনা কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. স্থানীয় সমাজের উপাদান কোনটি ?

ক. বিজ্ঞান ক্লাব খ. জাতীয় সংসদ

গ. ইউনিয়ন পরিষদ ঘ. সিটি কর্পোরেশন

২. সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া চলতে থাকে–

ক. শৈশব থেকে কৈশোর পর্যন্ত খ. কৈশোর থেকে যৌবন পর্যন্ত

গ. শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত ঘ. শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত

২০২০

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

মহসিন মা-বাবার সহযোগিতায় নিয়মিত পড়াশুনা করে। সে এখন আবৃত্তি দলের সদস্য। মা লক্ষ করলেন সে এখন পরিবারের সদস্য ও বন্ধুবান্ধবের সাথে আগের চেয়ে ভালো ব্যবহার করছে।

৩. **মহসিনের পরিবর্তনে কোন প্রক্রিয়াটি কাজ করেছে ?**

ক. সামাজিকীকরণ	খ. রাজনৈতিক
গ. অর্থনৈতিক	ঘ. পারিবারিক

৪. **উক্ত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি–**

i. সমাজের নিয়ম পালনে অভ্যস্ত হয়ে গড়ে উঠে

ii. সঠিক আচরণ করতে শিখে

iii. সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i	খ. ii
গ. iii	ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মিজান ও রাসেলের বন্ধু শিহাব ৮ম শ্রেণির ছাত্র। আন্তঃহাউজ ইনডোর প্রতিযোগিতায় শিহাব দাবায় পর পর দুইবার প্রথম হয়েছে। রাসেল শিহাবের অনুপ্রেরণায় দাবা শিখে এই বৎসর দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে। মিজান ইদানীং প্রায়ই স্কুলে দেরি করে আসে। বাড়ির কাজ ঠিকমতো করে নিয়ে আসে না। শিক্ষক মিজানের মায়ের কাছে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারে সে রাত জেগে ইন্টারনেট ব্যবহার করে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়।

ক. গণমাধ্যম কী ?

খ. ব্যক্তির সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ? ব্যাখ্যা কর।

গ. রাসেলের দাবায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারের ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণের কোন প্রতিষ্ঠানটি প্রভাব বিস্তার করেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "মিজানের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির অপব্যবহার লক্ষ করা যায়"– বিশ্লেষণ কর।

২. শাহেদ সাহেব একজন আর্কিটেক্ট (স্থপতি)। তিনি বড় কাগজে একটি বাড়ির নকশা করছিলেন। তার ৫ বছরের ছেলে রনি তার দেখাদেখি কাগজ পেন্সিল নিয়ে আঁকতে শুরু করে। কিছুক্ষণ পর সে বাবাকে তার আঁকা ছোট ছোট ঘরগুলো দেখায়। বাবা তাকে উৎসাহ দিয়ে বলেন-তোমাকে গ্রামে নিয়ে সত্যিকারের খড়ের ঘর, গাছ, নদী দেখাব। কিছুদিন পর গ্রামে বেড়াতে গেলে গ্রামে বসবাসরত তার চাচাত ভাই সোহেল তাকে মাঠ, পুকুর, ঘরবাড়ি, গাছপালা ইত্যাদি দেখিয়ে আবার আঁকতে বলে।

ক. সামাজিকীকরণের সবচেয়ে শক্তিশালী বাহন কী?

খ. নিজের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী অপরকে পরিচালিত করার প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা কর।

গ. রনির ছবি আঁকায় সামাজিকীকরণের যে উপাদানের প্রভাব পড়েছে সেটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রনি ও সোহেলের জীবনে সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ায় কোনো পার্থক্য আছে কী? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশের অর্থনীতি

বাংলাদেশকে বলা হয় কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের বেশির ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। আর কৃষিই তাদের জীবিকার প্রধান উপায়। এছাড়াও গ্রামাঞ্চলে কিছু লোক যেমন- তাঁতি, জেলে, কুমার, কামার, মুদি দোকানদারও ছোটখাটো ব্যবসা করে জীবন ধারণ করে। শহরাঞ্চলের মানুষ প্রধানত চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্য করে। এছাড়াও শহরে বহু লোক রিক্সা, ঠেলা ও ভ্যানগাড়ি চালক, মুটে, মজুর, ছোট দোকানদার ও ফেরিওয়ালা ইত্যাদি হিসাবে জীবন ধারণ করে। এসব কাজ হয় ব্যক্তি উদ্যোগে। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় মালিকানায়ও এদেশে কিছু কিছু শিল্পকারখানা এবং রেল, সড়ক ও নৌপরিবহন ব্যবস্থা চালু রয়েছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ সেবামূলক খাতও রয়েছে। বর্তমানে বেসরকারি মালিকানায় দেশে অনেক শিল্পকারখানা ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। দেশের উন্নয়নে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তাছাড়া বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে এই খাত থেকে। এভাবে সরকারি ও বেসরকারি দুই খাতকে নিয়েই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনধারা বিকশিত হচ্ছে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি), মোট জাতীয় উৎপাদন (জিএনপি) ও মাথাপিছু আয়ের ধারণা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- দেশের মোট জাতীয় আয়ে যেসব খাত অবদান রাখছে তা বর্ণনা করতে পারব;
- মানব সম্পদ উন্নয়নের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশে মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে পারব এবং অন্যান্য দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের সঙ্গে তুলনা করতে পারব;
- মানব উন্নয়ন সূচকের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মানব উন্নয়ন সূচকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও উন্নয়নশীল কয়েকটি দেশের তুলনা করতে পারব;
- বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের প্রেরিত রেমিটেন্স ও অর্থনীতিতে এর প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মানব উন্নয়ন সূচকের ভিত্তিতে দেশের উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালনের মনোভাব অর্জন করব।

পাঠ-১ : মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)

একটি দেশের অভ্যন্তরে দেশি বা বিদেশি নাগরিকদের দ্বারা প্রতি বছর উৎপাদিত সকল দ্রব্য ও সেবার মোট আর্থিক মূল্য হচ্ছে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)। জিডিপি হিসাব করা হয় মূলত একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির শক্তি বা সামর্থ্য বোঝার জন্য।

তবে দেশের কোনো ব্যক্তি যদি বিদেশে কাজ করে অথবা কোনো কোম্পানি যদি বিদেশে ব্যবসা করে দেশে টাকা পাঠায় সেই আয় মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন হিসাবে পরিগণিত হবে না অর্থাৎ জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হবে না। মূলত জিডিপি হচ্ছে একটি দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের আর্থিক মূল্য।

মোট জাতীয় উৎপাদন : (জিএনপি)

একটি দেশের নাগরিক নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছর) যে সকল দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে তার মোট আর্থিক মূল্য হচ্ছে মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP)। অর্থাৎ একটি দেশের নাগরিক নিজ দেশসহ বিশ্বের যেখানেই চাকরি বা ব্যবসা করুক না কেন যখন তাদের অর্জিত আয় দেশের অর্থনীতিতে যুক্ত হয় তখন তা মোট জাতীয় উৎপাদন হিসাবে বিবেচিত হবে। জিএনপি হিসাব করা হয় একটি দেশের নাগরিকদের অর্থনৈতিক অবদান বোঝার জন্য। যেমন−কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিদেশে চাকরি বা ব্যবসা করে অর্জিত অর্থের যে পরিমাণ অর্থ বৈধপথে বাংলাদেশে পাঠায় তা বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের অংশ হবে।

মাথাপিছু আয়

একটি দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের যোগফলকে সেই দেশের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে 'মাথাপিছু আয়' পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে একটি দেশের মানুষের সার্বিক জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করা হয়। যে দেশের মাথাপিছু আয় যত বেশি সে দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান তত উন্নত এবং অর্থনীতি তত বেশি সমৃদ্ধ।

$$\text{মাথাপিছু আয়} = \frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট জাতীয় আয়}}{\text{ঐ বছরের মোট জনসংখ্যা}}$$

যেমন, ২০১১ সালে একটি দেশের মোট জনসংখ্যা ছিলো ১০ কোটি এবং ঐ সময়ে মোট জাতীয় উৎপাদন বা আয় হলো ৫০০০ কোটি মার্কিন ডলার।

$$\text{সুতরাং মাথাপিছু আয়} = \frac{\text{৫০০০ কোটি মার্কিন ডলার}}{\text{১০ কোটি}} = \text{৫০০ মার্কিন ডলার।}$$

যে কোনো দেশের কৃষি, শিল্প, সেবাসহ যাবতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের আয় বৃদ্ধি করা। জনগণের আয় বৃদ্ধি পেলে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায় এবং দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয়। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ফলে ধীরে ধীরে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

একটি দেশ কতোটা উন্নত বা অনুন্নত তা বিচার করা হয় কতোগুলো সূচক বা মানদণ্ডের সাহায্যে। এই মানদণ্ডগুলো হলো দেশটির মোট জাতীয় উৎপাদন, জনগণের মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার মান প্রভৃতি। এইসব দিক বিচারে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে অনেক উন্নতি লাভ করেছে। আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার প্রতি বছরই পূর্ববর্তী বছরগুলোকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে যেমন আছে আমাদের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন তেমনি আছে প্রবাসে কর্মরত শ্রমিক ও অন্যান্য চাকরিজীবীদের অবদান। বাংলাদেশ ব্যাংকের এক হিসাবে দেখা যায়, ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরে যেখানে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (Gross Domestic Product : GDP) পরিমাণ ছিল ৩,৭০,৭০৭ কোটি

টাকা, সেখানে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে এর পরিমান ২২,৩৮,৪৯৮ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

(উৎস : অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৮)

দেশের কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মূল লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি। দেশে উৎপাদন বাড়লে জনগণের জীবনযাত্রার উপর তার প্রভাব পড়বে। দারিদ্র্য হ্রাস পাবে, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে, কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে, বেকারত্ব হ্রাস পাবে। এর সঙ্গে যদি আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকেও নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, তবে প্রবৃদ্ধির সূচকে আমাদের দেশ অনেক এগিয়ে যাবে।

কাজ : জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয় ধারণা দুটি ব্যাখ্যা কর।

পাঠ- ২ : বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে বিভিন্ন খাতের অবদান

বাংলাদেশে জাতীয় আয়ের উৎস হিসাবে আমরা অনেকগুলি খাতের নাম উল্লেখ করতে পারি। যেমন: কৃষি ও বনজ, মৎস্য, শিল্প, খনিজ, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ, নির্মাণ শিল্প, পাইকারি ও বিপণন, হোটেল- রেস্তোরা, পরিবহন ও যোগাযোগ, ব্যাংক-বিমা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ব্যবসা-বাণিজ্য, শুল্ক প্রভৃতি। এর মধ্যে আমাদের জাতীয় উৎপাদন ও আয়ের কয়েকটি খাত নিচে উল্লেখ করা হলো :

ক) কৃষি ও বনজ: খাদ্যশস্য, শাকসবজি ও বনজ সম্পদ এই খাতের অন্তর্ভূক্ত। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে এই খাতের অবদান ছিল ১৩.০৯ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১.৪৭ শতাংশ। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এই খাতের অবদান ছিল ১১.১২ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১.৯৬ শতাংশ।

খ) মৎস খাত: ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ নদী ও অন্যান্য জলাশয় এবং সামুদ্রিক উৎস থেকে মাছ আহরণসহ দেশজ উৎপাদনে মৎস খাতের অবদান ছিল ৩.৬৮ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.১৮ শতাংশ। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এই খাতের অবদান ছিল ৩.৬১ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.২৩ শতাংশ।

গ) শিল্পখাত: ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে জাতীয় উৎপাদনে শিল্পখাতের অবদান ছিল ১৯.০০ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১০.৩১ শতাংশ। পোশাক শিল্প, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সরবরাহ, খনিজ সম্পদ ও নির্মাণ শিল্প প্রভৃতিকে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত করায় জাতীয় অর্থনীতিতে এই খাতের অবদান অনেক বেড়ে যায়। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এই খাতের অবদান ২১.৭৪ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১০.৯৭ শতাংশ।

ঘ) পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য: ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে জাতীয় আয়ে এই খাতের অবদান ছিল ১৪.০৩ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.১৮ শতাংশ। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এই খাতের অবদান ছিল ১৪.০১ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.৩৭ শতাংশ।

ঙ) পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ: ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে জাতীয় আয়ে এই খাতের অবদান ছিল ১১.৫০ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.২৭ শতাংশ। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এই খাতের অবদান ছিল ১১.২৬ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৭৬ শতাংশ।

চ) স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা খাত: ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে জাতীয় আয়ে এই খাতের অবদান ছিল ১.৮৮ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪.৭৬ শতাংশ। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এই খাতের অবদান ছিল ১.৮৫ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.৬৩ শতাংশ।

গুরুত্ব

এককভাবে ধরলে আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদনে কৃষির অবদানই সর্বাধিক। তবে শিল্পের ভূমিকাও দিন দিন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এছাড়া সেবা খাতসমূহও দেশের অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখছে। বর্তমান বিশ্ব প্রযুক্তি-নির্ভর। কৃষি, শিল্প, যোগাযোগ, সেবা প্রভৃতি খাতের উন্নয়নে প্রযুক্তির বিকাশকে কাজে লাগিয়ে আমরা সহজেই আমাদের জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি করতে পারি। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন খাতের উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় ও আয়ের ভারসাম্য রাখা গেলে জনগণের জীবনমানের উন্নয়নেও তা সহায়ক হবে।

কাজ : বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদন বা আয় বৃদ্ধিতে যেসব খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি কর এবং খাতওয়ারি অবদানের বিবরণ দাও।

পাঠ- ৩ : বাংলাদেশে মানব উন্নয়ন

মানব সম্পদ উন্নয়ন

মানুষ তখনই রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পদে পরিণত হয় যখন সে কিছু করতে পারে। কেউ শারীরিক শ্রম দিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য সম্পদ তৈরিতে সহায়তা করে আবার কেউ মেধা দিয়ে নতুন নতুন সম্পদ উদ্ভাবন করে সহায়তা করে থাকে। দেশের কৃষি, শিল্প বা সেবাখাতে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে যারা শ্রম ও মেধা দিয়ে কাজ করেন তারা নিজেদেরকে শ্রমশক্তিতে রূপান্তরিত করেন। শ্রমশক্তি সম্পন্ন মানুষকেই দেশের মানব সম্পদ বলা হয়। প্রতিটি অদক্ষ মানুষকে শ্রমশক্তি সম্পন্ন বা মানব সম্পদে পরিণত করাই হচ্ছে মানব সম্পদের উন্নয়ন। উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বাসস্থান, চিকিৎসা ও খাদ্যের সংস্থানের মাধ্যমেই মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। কোনো অদক্ষ মানুষ নয়, কেবলমাত্র দক্ষ মানুষই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। সুতরাং দেশের সকল মানুষকে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান লাভের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষতা সৃষ্টি করতে হবে। দক্ষতা অনুযায়ী কাজ করার জন্য সুস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। অতএব চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ও উৎপাদনমুখী সম্পদ হিসাবে গড়ে তোলাই মানব সম্পদের উন্নয়ন।

২০২০

বাংলাদেশে মানব সম্পদ উন্নয়ন

১লা জানুয়ারি ২০১৬ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ১৬ কোটি ৮ লক্ষ। ২০১১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৬৪ জন। বিবিএস পরিচালিত সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৬-১৭' অনুযায়ী ১৫ বছরের উপরে মাত্র ৬ কোটি ৩৫ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান ছিল। উক্ত শ্রমশক্তির শতকরা ৪০.৬ ভাগ কৃষি, ২০.৪ ভাগ শিল্প এবং ৩৯.০ ভাগ বিভিন্ন সেবাখাতে নিয়োজিত রয়েছে। মোট জনসংখ্যার ৪ কোটি ৩৫ লক্ষ পুরুষ এবং ২ কোটি নারী কাজে নিয়োজিত রয়েছে। বাকী মানুষ সার্বক্ষণিক কাজের সঙ্গে যুক্ত নয়। তবে তাদের মধ্যে ১৫ বছরের নিচের শিশু-কিশোর ও বৃদ্ধ মানুষ রয়েছেন। (উৎস: অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮)

আমাদের দেশে সাক্ষরতার হার এখন দ্রুতগতিতে বাড়ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৭২.৮ (উৎস: Human Development Reports 2018); ২০০৯ সালে এই হার ছিল ৫৪.৮%। দেশে স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যাপক সমস্যা রয়েছে। ফলে আমাদের বিপুল জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। দারিদ্র্যের কারণে বেশির ভাগ মানুষ তাদের সন্তানদের শিক্ষা ও খাদ্যের যোগান দিতে পারছে না। ফলে তারা দ্রুত দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হয়ে উঠতে পারছে না। আমাদের দেশের মানুষ দক্ষ জনসম্পদে পরিণত না হওয়ার কারণ 'দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র'। নিচের উদাহরণটি পড়লেই এ চক্রটি কীভাবে মানব সম্পদে পরিণত হওয়ার পথে বাধা তা পরিষ্কার হওয়া যাবে।

দরিদ্র লোকের পর্যাপ্ত খাদ্য থাকে না বলে দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। তাই এরা কাজ পায় না বা করতে পারে না। ফলে আয় কম হয়। কম আয়ের কারণে সঞ্চয় করতে পারে না বা কম সঞ্চয় করে। এ কারণে বিনিয়োগ কম হয় বা মূলধন কম থাকে, ফলে এরা দরিদ্রই থেকে যায়। সুতরাং দারিদ্র্যের এই চক্রাকার আবর্তের কারণে মানব সম্পদ উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তাই বাংলাদেশে মানব উন্নয়ন পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন জনসাধারণকে খাদ্যের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

কাজ : দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র কীভাবে উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে ?

পাঠ- ৪: মানব উন্নয়ন সূচক

জিডিপি, জিএনপি এবং মাথাপিছু আয় ইত্যাদি হিসাবগুলোতে যে সমস্ত শ্রম বাজারে বিক্রি করা হয় না সেগুলোকে ধরা হয় না। ফলে একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর শ্রম জাতীয় আয়ের অংশ হিসাবে মর্যাদা পায় না যা প্রকারান্তরে মানুষে মানুষে অসমতা সৃষ্টি করে। যেমন, গৃহস্থালি দৈনন্দিন কাজে নারীরা যে শ্রম দেয় তা হিসাবের মধ্যে না নেওয়ায় একদিকে যেমন মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রকৃত হিসাব পাওয়া যায় না, অন্যদিকে তা গৃহস্থালি কাজে নারীর শ্রমকে মূল্যহীন করে তোলে।

উপরোক্ত সমস্যাসহ আরও নানা সীমাবদ্ধতার কারণে একটি দেশের মানুষ প্রকৃত বিচারে কেমন আছে তা জানার জন্য ব্যবহার হচ্ছে 'মানব উন্নয়ন সূচক' (Human Development Index) ধারণা। এখানে নানান সূচক ব্যবহার করে দেখা হয় যে, একটি দেশের অর্থনীতি কতটা কল্যাণমুখী। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সূচক হচ্ছে গড় আয়ু, গড় সামাজিক অসমতা, প্রসবকালীন মৃত্যুর হার,

বেকারত্বের হার, দারিদ্র্যের হার, শিশুশ্রমের হার, কর্মহীন ও সামাজিকভাবে অসহায় হত-দরিদ্রের হার, বাল্যবিবাহের হার, বাল্য মাতৃত্বের হার, আয়ের বৈষম্যের হার, সাক্ষরতার হার, পরিবেশ বান্ধব টেকসই উন্নয়ন ইত্যাদি।

কোনো দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান কেমন তা বোঝার জন্য এ সংক্রান্ত কিছু নির্ধারক তথ্য প্রয়োজন যাকে সেগুলোর মানব উন্নয়নের সূচক বলা হয়। যেমন, জনগণের সাক্ষরতার হার কতো, ছাত্রভর্তির সংখ্যা বা হার কতো, তাদের আয় কতো, ব্যয় কতো, তারা কেমন বাড়ি ও চিকিৎসা পাচ্ছে, তাদের খাদ্য গ্রহণের অবস্থা কেমন ইত্যাদি। এ ধরনের বেশ কিছু সূচককে একত্রিত করে বলা হয় ঐ দেশ বা জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান কেমন।

মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থা

বর্তমানে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, মোট জাতীয় উৎপাদন ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকার সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক খাতে বাজেটের ২০% বেশি ব্যয় করছে। ২০১৮ সালের Human Development Report মোতাবেক মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৬ তম যা ২০১4 সালে ছিল ১4২ তম। সরকার শিক্ষার সকল স্তরে সমান সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়নসহ নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিধি প্রবর্তনের ফলে মহিলা শিক্ষকের হার ১৯৯১ সালের ২১% থেকে বর্তমানে ৬৪.৯% উন্নীত হয়েছে। এছাড়া সরকার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়ায় প্রজনন হার ও মৃত্যু হার কমেছে, গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে, নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হার উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে, অপুষ্টির হার হ্রাস পেয়েছে।

বাংলাদেশে ২০১৬ সালে পরিচালিত সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপ অনুযায়ী ২০১০ সাল থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে আয়ভিত্তিক দারিদ্র্যের হার ৩১.৫ শতাংশ থেকে ২৪.৩ শতাংশে নেমে আসে। অপরদিকে, ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে আয়ভিত্তিক দারিদ্র্যের হার ৪০.০ শতাংশ থেকে ৩১.৫ শতাংশে নেমে আসে।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি আনয়নের লক্ষ্যে হত-দরিদ্র বিশেষ করে বয়স্ক, দুঃস্থ নারী, মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, এতিমসহ আরও অনেককে নগদ ভাতা ও বিনামূল্যে খাদ্য প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করছে। এর পাশাপাশি একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রয়ণ, গৃহায়ণ ইত্যাদি প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

উপরোক্ত নানাবিধ কর্মসূচি সফলভাবে এগিয়ে নেওয়ায় বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের স্বীকৃতি পেয়েছে এবং নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। উন্নয়নশীল কয়েকটি দেশের সাথে মানব উন্নয়ন সূচকের নিরিখে বাংলাদেশের তুলনা করলেই আমরা এই অর্জনের যথার্থতা অনুধাবন করতে পারব।

কাজ : মানব উন্নয়ন সূচকের মাপকাঠিতে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ণয় কর।

২০২০

পাঠ- ৫ : বাংলাদেশ ও উন্নয়নশীল কয়েকটি দেশের তুলনা

একটি দেশের মানব উন্নয়ন পরিস্থিতি নির্ণয় করা হয় : মাথাপিছু আয়, ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে স্কুলে ভর্তির হার, ১৫ বছরের অধিক বয়সের সাক্ষরতার হার, সঞ্চয়ের হার, চিকিৎসা খরচ, বসতির হার, ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের খরচ, বেকারের হার, শিক্ষা খরচ, মাথাপিছু জাতীয় আয় (জিএনআই) ও প্রতিদিন ১.২৫ ডলারের নিচে জীবিকা নির্বাহকারী মানুষের সংখ্যা, জন্ম ও শিশু মৃত্যুর হার ইত্যাদি। নিচে উপস্থাপিত সারণি থেকেই একটি দেশের মানব উন্নয়ন পরিস্থিতি বোঝা যায়।

আমরা নিচে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মানব উন্নয়ন সূচকের চিত্র তুলে ধরছি:

সারণি-১

সূচক	বছর	বাংলাদেশ	ভারত	পাকিস্তান	শ্রীলঙ্কা	মালয়েশিয়া	ইন্দোনেশিয়া
সঞ্চয় (%জিডিপি)	২০১০	২৬.২	৩৩.৪	১৪.২	২৩.৭	২২.৪	৩১.০
	২০১৮	৩০.৫	২৮.৫	১৪.৫	২৬.৪	২৫.৩	৩২.২
সাক্ষরতার হার (১৫বছরের অধিক বয়সের)	২০১০	৪৭.১	৬৯.৩	৫৫.৪	৯১.২	৯৩.১	৯২.৮
	২০১৮	৭২.৮	৬৯.৩	৫৭.০	৯১.২	৯৩.১	৯৫.৪
বেকারত্বের হার (% শ্রমশক্তির)	২০১০	৩.৪	৩.৫	০.৭	৪.৯	৩.৩	৫.৬
	২০১৮	৪.৪	৩.৫	৪.০	৪.১	৩.৪	৪.৩

উৎস: UNDP Human Development Data (1990-2017), 2018

উপরের সূচকগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখি। ২০১০ সালে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার (১৫ বছরের অধিক বয়সের) ছিল ৪৭.১%, ভারতে ৬৯.৩%, পাকিস্তানে ৫৫.৪%, শ্রীলঙ্কায় ৯১.২%, মালয়েশিয়ায় ৯৩.১% এবং ইন্দোনেশিয়ায় ৯২.৮%। ২০১৮ সালে উক্ত হার বাংলাদেশে বেড়ে ৭২.৮%, পাকিস্তানে ৫৭%, ইন্দোনেশিয়ায় ৯৫.৪% হয়েছে কিন্তু ভারত, শ্রীলঙ্কা ও মালয়েশিয়ায় একই রয়েছে। অন্যান্য সূচকেও বিভিন্ন দেশে মানব উন্নয়নের চিত্র সারণিতে লক্ষ করো।

২০১৮ সালের Human Development Report অনুযায়ী মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৬ তম, ভারতের ১৩০ তম এবং পাকিস্তানের অবস্থান ১৫০ তম। বাংলাদেশে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল যেখানে ৭২.৮ বছর, ভারতে তা ৬৮.৮ বছর এবং পাকিস্তানে ৬৬.৬ বছর। আয়ভিত্তিক বৈষম্যের হার বাংলাদেশে ১৫.৭%, ভারতে ১৮.৮%, পাকিস্তানে ১১.৬%। মানব উন্নয়ন সূচকে লিঙ্গীয় বৈষম্যের হার, অতি দারিদ্র্যের হার, মোট জনসংখ্যা অনুপাতে কর্মসংস্থানের হার ইত্যাদি বিষয়গুলোও বিবেচনা করা হয়।

(উৎস: UNDP Human Development Report 2018)

বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে এই বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি এবং একই সাথে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য' (Sustainable Development Goal) অর্জনে এগিয়ে চলছে।

কাজ : সারণি-১ অনুযায়ী বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মানব উন্নয়নের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধর।

পাঠ-৬ : প্রবাসী আয় বা রেমিটেন্স

প্রবাসী কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থকে রেমিটেন্স (Remittance) বলে। বিদেশে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারি ও পেশাজীবীরা তাদের অর্জিত অর্থের একটা অংশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবারের কাছে পাঠায়। এই অর্থ কেবল তাদের পরিবারের প্রয়োজনই মিটায় না, কিংবা তাদের জীবনযাত্রার মানই বাড়াচ্ছে না, নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ আসছে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্স থেকে।

অর্থনীতিতে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত রেমিটেন্সের প্রভাব

বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাজ করছে। মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, মিসর, লিবিয়া, মরক্কোসহ অনেক দেশে বাংলাদেশের শ্রমিক ও পেশাজীবীরা কাজ করছেন। একইভাবে নিকট ও দূর প্রাচ্যের মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ব্রুনাই, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলোতেও বাংলাদেশের বহু মানুষ নানা পেশায় নিয়োজিত আছে। ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকাতেও বহু বাংলাদেশি চাকরি ও ব্যবসাসহ নানা ধরনের কাজ করছেন। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের সংখ্যা ছিল ৯.০৫ লক্ষ এবং তাদের পাঠানো অর্থের পরিমান (রেমিটেন্স) ছিল ১২,৭৬৯.৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অথচ ২০০৮ - ২০০৯ অর্থবছরে এই রেমিটেন্সের পরিমান ছিল ৯৬৮৯ মিলিয়ন ডলার। বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে ২০০৮ সালে বিশ্বের সর্বোচ্চ রেমিটেন্স প্রাপ্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১২তম। ২০০৯ সালে তা ৮ম স্থানে উন্নীত হয়। এ সময় সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের স্থান ছিল ২য়। বিশ্ব মন্দা পরিস্থিতি সত্ত্বেও ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি বড় ধরনের কোনো সংকটের মধ্যে না পড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রবাসীদের পাঠানো বিপুল অঙ্কের রেমিটেন্স।

কাজ : রেমিটেন্স কীভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে ব্যাখ্যা কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জাতীয় উৎপাদনে এককভাবে কোন খাতের অবদান সর্বাধিক?

ক. কৃষি খ. শিল্প

গ. ব্যবসা ঘ. স্বাস্থ্য

২. জাতীয় আয়ের অন্তর্গত উপাদান-

i. গায়কের গান গাওয়া

ii. গৃহিনীর রান্না করা

iii. ব্যবসা-বাণিজ্য করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

শফিক ১৬ বছরের যুবক। কিন্তু অনাহারে অর্ধাহারে তার শরীর অত্যন্ত দুর্বল। ফলে সে কোথাও কাজ পায় না। অর্থাভাবে দিন দিন তার অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে।

৩. শফিকের দুরাবস্থা রাষ্ট্রের কোন পরিস্থিতিকে ইঙ্গিত করে?

ক. অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা খ. কর্মসংস্থানের অভাব

গ. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ঘ. প্রশিক্ষণের অভাব

৪. শফিককে মানবসম্পদে পরিণত করতে প্রয়োজন–

i. খাদ্য নিরাপত্তা প্রদান

ii. পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা

iii. শিক্ষার ব্যবস্থা করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২০২০

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মিস ওশিন গবেষণার কাজে তথ্য সংগ্রহের জন্য জাপান থেকে পার্শ্ববর্তী একটি উন্নয়নশীল দেশে আসেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করেন যে, দেশটির জনগণ তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য নানা প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। দেশটির অভ্যন্তরীণ বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ১০,০০০ কোটি মার্কিন ডলার। ঐ বছরে দেশটির প্রবাসী নাগরিকদের পাঠানো রেমিটেন্সের পরিমাণ ৫০০০ কোটি মার্কিন ডলার। দেশটির বর্তমান জনসংখ্যা ১৫ কোটি। সরকার দেশটির চাষাবাদে যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ, প্রযুক্তির ব্যবহার ও শিল্পের হার বৃদ্ধিতে গুরুত্ব দিচ্ছে।

ক. ২০০৯ সালে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার কতো ছিল?

খ. 'জাতীয় আয়' ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির জনগণের মাথাপিছু আয় নির্ণয়সহ পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে সরকারের নেওয়া উদ্যোগের মূল লক্ষ্য 'কর্মসংস্থান সৃষ্টি'– বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর।

২. রায়হান সাহেব দীর্ঘদিন চাকরি সূত্রে মালয়েশিয়ায় ছিলেন। কিছুদিন হলো তিনি দেশে নিজ গ্রামে ফিরে আসেন। তিনি লক্ষ করেন তার গ্রামসহ আশেপাশের গ্রামের কিশোর তরুণেরা স্কুল-কলেজে যায় না, বেকার ও অলস সময় কাটায়, শিশু মৃত্যুর হারও অত্যধিক। তিনি গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহায়তায় এলাকায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন।

ক. ২০১১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা কতো ছিল?

খ. 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পটি কী উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে, তা ব্যাখ্যা কর।

গ. রায়হান সাহেবের নেওয়া উদ্যোগ দেশে যে ধরনের সম্পদ সৃষ্টিতে সহায়ক তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উন্নয়ন সূচক অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থা বিশ্লেষণ কর।

সপ্তম অধ্যায়

বাংলাদেশ : রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা

রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সরকার রাষ্ট্র গঠনের একটি উপাদান। পৃথিবীর প্রতিটি স্বাধীন রাষ্ট্রের নিজস্ব সরকার ব্যবস্থা রয়েছে। সরকার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। আবার প্রতিটি সরকারের রয়েছে কিছু অঙ্গ। এগুলোর মাধ্যমে রাষ্ট্র নানামুখী কাজ করে থাকে। রাষ্ট্র পরিচালিত হয় সংবিধানে উল্লিখিত নীতিমালার ভিত্তিতে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়। এতে আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার বিবরণ রয়েছে।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- সরকার পদ্ধতির ধরন সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব ও সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করব;
- বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামো ও কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের সরকার পরিচালনায় সুশাসনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সুশাসনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমে সহযোগিতা করতে পারব।

পাঠ-১ : সরকারের শ্রেণিবিভাগ

রাষ্ট্রের অপরিহার্য চারটি মৌলিক উপাদানের একটি হচ্ছে সরকার। এটি রাষ্ট্রের মূল চালিকাশক্তি। ইঞ্জিন ছাড়া যেমন গাড়ি চলতে পারে না তেমনি সরকার ছাড়া রাষ্ট্র চলে না। রাষ্ট্র পরিচালনার সকল কাজ সরকারের মাধ্যমে সাধিত হয়।

সরকার রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান হলেও সব রাষ্ট্রের সরকারের ধরন এক নয়। যখন থেকে রাষ্ট্রের শুরু হয়েছে তখন থেকেই সরকারের ধরন এক রকম ছিল না। যুগে যুগে সরকারের ধরন ও ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানকালে সরকারকে নিচের ছক অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ করা হয় :

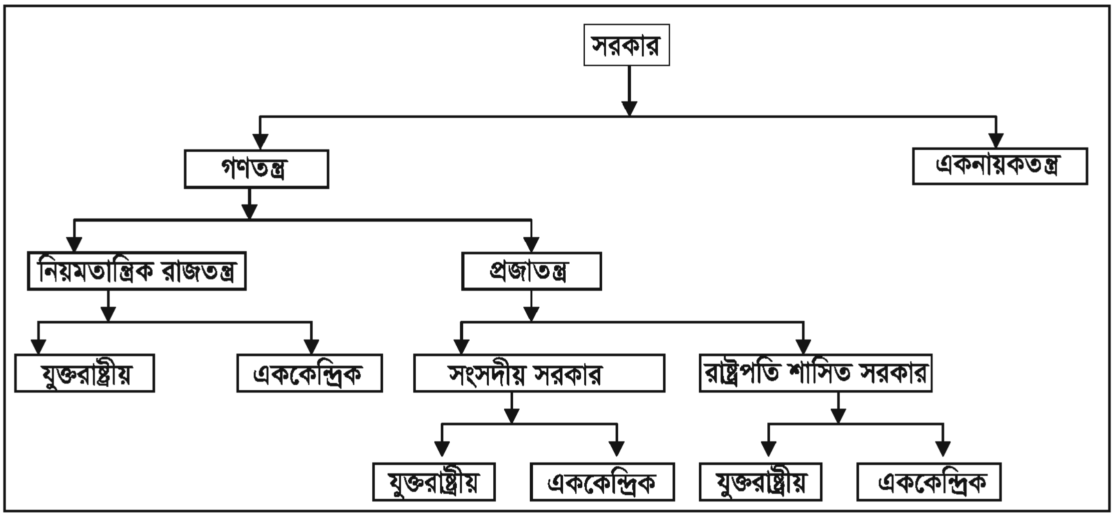

১. সরকারকে প্রধানত গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। গণতন্ত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। জনগণ তাদের পছন্দের রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিদের ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সরকার গঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনা করে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই এ ধরনের সরকার রয়েছে। অন্যদিকে একনায়কতন্ত্র হচ্ছে এক ব্যক্তির বা এক দলের শাসন। এতে জনগণের অধিকার ও মতামতের কোনো স্বীকৃতি থাকে না। এখানে একনায়ক বা এক দলের ইচ্ছা-অনিচ্ছা দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

২. রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে সরকারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ১. রাজতান্ত্রিক সরকার ও ২. প্রজাতান্ত্রিক সরকার। যে সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতা লাভ করেন তাই হলো রাজতন্ত্র। বর্তমানে দুই/একটি (সৌদি আরব) ব্যতিক্রম ছাড়া সরাসরি রাজতান্ত্রিক সরকার খুব একটা নেই। কিন্তু বিশ্বে অনেক রাষ্ট্রেই অতীত ঐতিহ্য ধরে রাখতে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র চালু আছে (যেমন: গ্রেট ব্রিটেন)। অন্যদিকে জনগণের ভোটে যে সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হন সে সরকার হলো প্রজাতান্ত্রিক সরকার। এ ধরনের ব্যবস্থায় জনগণকে রাষ্ট্রের মালিক মনে করা হয়।

৩. ক্ষমতা বণ্টনের নীতির উপর ভিত্তি করে গণতান্ত্রিক সরকারকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায় : এককেন্দ্রিক সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার। যে সরকার ব্যবস্থায় কেন্দ্রের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে তাকে বলে এককেন্দ্রিক সরকার। আর যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়।

৪. আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের আলোকে গণতান্ত্রিক সরকারকে দুইভাগে ভাগ করা হয়: সংসদীয় সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার। সংসদীয় সরকারে শাসন বিভাগ আইন বিভাগের উপর নির্ভরশীল ও সংসদের কাছে দায়ী থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে শাসন বিভাগ আইন বিভাগের নিকট দায়ী বা তার উপর নির্ভরশীল থাকে না। এখানে রাষ্ট্রপতি তার মন্ত্রিপরিষদ নিয়ে সরাসরি দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন।

কাজ- ১ : সরকার পদ্ধতির ধরনগুলো একটি পোস্টার পেপারে চার্ট আকারে উপস্থাপন করে শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে ঝুলিয়ে দাও।

পাঠ- ২ : বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রে প্রজাতান্ত্রিক সরকার বিদ্যমান। এখানে জনগণ রাষ্ট্রের মালিক। এর কোনো প্রদেশ নেই। একটি কেন্দ্র থেকেই শাসনকার্য পরিচালিত হয়। এতে সংসদীয় তথা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিকভাবে একজন রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন।

ছক: বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

২০২০

সরকার প্রধান বা নির্বাহী প্রধান হিসাবে থাকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ। এই শাসন ব্যবস্থায় আইনসভার প্রাধান্য বিদ্যমান। মন্ত্রিপরিষদ রাষ্ট্রের যেকোনো নির্বাহী কার্য সম্পাদনের জন্য আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ থাকে।

কাজ- ১ : 'বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' দুটি উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ কর।

পাঠ-৩ : বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি

১৯৭২ সালের মূল সংবিধান এবং সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ হলো :

১. **জাতীয়তাবাদ :** একই ধরনের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বাঙালি জাতির মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য সৃষ্টি করেছে। তাই সংবিধানে বলা হয়েছে, একই ভাষা ও সংস্কৃতিতে আবদ্ধ বাঙালি জাতি যে ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে সেই ঐক্য ও সংহতি হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।

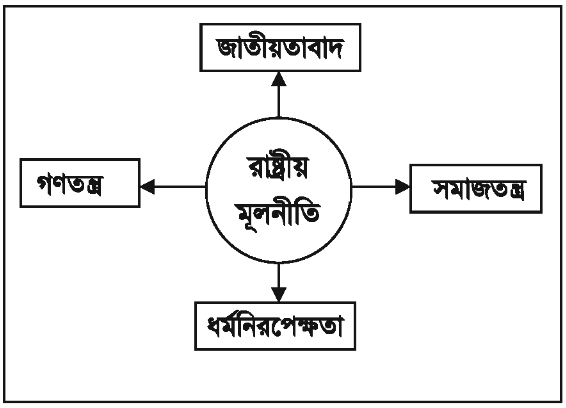

ছক : বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি

২. **সমাজতন্ত্র :** অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমতা আনার মাধ্যমে সবার জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করাই হলো সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য। শোষণমুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রের একটি মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. **গণতন্ত্র :** রাষ্ট্রের সকল কাজে নাগরিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই হলো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূলনীতি। এর মাধ্যমে নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে; মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে।

৪. **ধর্ম নিরপেক্ষতা :** রাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে এবং ধর্ম পালনে কেউ কাউকে বাধা প্রদান করবে না- এই লক্ষ্য সামনে রেখে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লিখিত মূলনীতিগুলো রাষ্ট্র পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়। প্রতিটি নাগরিকের উচিত এগুলো মেনে চলা। এছাড়া সংবিধান রাষ্ট্র পরিচালনার পবিত্র দলিল। অতএব, সংবিধানকে সম্মান করা ও তা মেনে চলা প্রতিটি নাগরিকের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য।

কাজ : গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এ দুটি মূলনীতি আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে কীভাবে অনুসরণ করতে পারি তার দুটি করে উদাহরণ দাও।

পাঠ- ৪ : বাংলাদেশের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য

সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল। একটি ভবন বা ইমারত যেমন এর নকশা দেখে তৈরি করা হয়, তেমনি সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। সরকার কী ধরনের হবে, নাগরিক হিসাবে আমরা কী অধিকার ভোগ করব, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ কী ক্ষমতা ভোগ করবে তার সবকিছুই এতে লিপিবদ্ধ থাকে। বাংলাদেশের সংবিধান রচনার ইতিহাস :

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ। দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় অর্জিত হয়। ১৯৭২ সালের ১০ই এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে এবং ড. কামাল হোসেনকে সভাপতি করে একটি সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ছয় মাসের মধ্যে খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করে। ১৯৭২ সালের ৩০শে অক্টোবর গণপরিষদে এটি আলোচিত হয়। অবশেষে একই বছরের ৪ঠা নভেম্বর গণপরিষদে এটি চূড়ান্ত অনুমোদন পায়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতে, "এই সংবিধান লিখিত হয়েছে লাখো শহিদের রক্তের অক্ষরে"। তাই এটি আমাদের সবার কাছে একটি পবিত্র দলিল হিসাবে গণ্য।

সংবিধান কোনো অপরিবর্তনশীল বিষয় নয়। সময়ের প্রয়োজনে এটি পরিবর্তিত এবং সংশোধিত হতে পারে। এ যাবৎ ১৭ বার সংশোধিত হয়েছে। সংবিধানের সর্বশেষ সংশোধনী (সপ্তদশ) সংসদে পাস হয় ৮ই জুলাই ২০১৮।

আমাদের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

১. **গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার :** বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত হবে।

২. **সংসদীয় পদ্ধতির সরকার :** বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা চালু থাকবে। এই পদ্ধতিতে প্রকৃত শাসন ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে থাকবে। ২০২০

৩. **লিখিত সংবিধান :** এটি একটি লিখিত দলিল। যা ১১ ভাগে বিভক্ত এবং এতে ১৫৩টি অনুচ্ছেদ ও একটি প্রস্তাবনা আছে।

৪. **রাষ্ট্রীয় মূলনীতি :** সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো হলো : জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

৫. **রাষ্টধর্ম :** সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও অন্য সকল ধর্ম ও ধর্মের অনুসারীদের সমান মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

৬. **জাতি ও জাতীয়তা :** ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বাদে জাতি হিসাবে বাংলাদেশের জনগণ 'বাঙালি' নামে পরিচিত হবে এবং বাংলাদেশের নাগরিকদের পরিচয় হবে 'বাংলাদেশি'।

৭. **এককেন্দ্রিক সরকার :** দেশে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকবে।

৮. **এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা :** সংবিধানে এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত ৩০০ জন সংসদ সদস্য ও তাদের দ্বারা নির্বাচিত ৫০ জন মহিলা সংসদ সদস্য নিয়ে এই আইনসভা গঠিত হবে।

৯. **মৌলিক অধিকার :** সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও তা সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

১০. **জনগণের সার্বভৌমত্ব :** সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই ক্ষমতা পরিচালনা করবে।

১১. **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা :** সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

১২. **সর্বজনীন ভোটাধিকার :** সংবিধানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ১৮ বছর থেকে তদুর্ধ বয়সের সকল নাগরিককে ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

১৩. **নির্বাচন অনুষ্ঠান :** কোনো কারণে সংসদ ভেঙে গেলে বা অবলুপ্ত হলে সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪. **সংবিধান সংশোধন :** সংসদ সদস্যদের মোট সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে সংবিধান সংশোধন করা যাবে।

কাজ-১ : বাংলাদেশের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত কর।

কাজ-২ : বিদ্যালয় বা আশেপাশের অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের পাঠাগার থেকে বাংলাদেশের সংবিধান সংগ্রহ করে সংক্ষেপে এর পরিচিতি লেখ।

পাঠ-৫ : বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ ও কাজ

সরকার রাষ্ট্রের মূল চালিকা শক্তি। সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্র যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে। সরকার ছাড়া রাষ্ট্র চলতে পারে না। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকার বিভিন্ন কাজ করে। যেমন, নাগরিক হিসাবে আমাদের জন্য খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। জনগণের অধিকার ও কল্যাণের জন্য আইন প্রণয়ন করে। কেউ সে আইন অমান্য করলে শাস্তির ব্যবস্থা করে। এ ধরনের আরও অনেক কাজ আছে যা সরকার করে থাকে। সরকারের এ কাজগুলো সম্পাদনের জন্য তিনটি বিভাগ রয়েছে। এগুলো হলো (১) আইন বিভাগ (২) শাসন বিভাগ এবং (৩) বিচার বিভাগ।

সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ ও এদের গঠন :

নিচের ছকে বাংলাদেশ সরকারের তিনটি বিভাগ-সংশ্লিষ্ট তিনটি ছবি :

বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ

↓

আইন বিভাগ | শাসন বিভাগ | বিচার বিভাগ

জাতীয় সংসদ

বাংলাদেশ সচিবালয়

সুপ্রিম কোর্ট

প্রথম ছবিটি জাতীয় সংসদ ভবনের। এটি ঢাকার শেরেবাংলা নগর-এ অবস্থিত। জাতীয় সংসদে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা দেশ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করেন এবং অন্যান্য নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত নেন।

দ্বিতীয় ছবিটি বাংলাদেশ সচিবালয়ের। সংসদে যে সকল আইন প্রণয়ন করা হয় সে অনুযায়ী নীতিনির্ধারণ ও সরকারের শাসনকাজ পরিচালিত হয় সচিবালয় থেকে।

শেষের ছবিটি সুপ্রিম কোর্টের। এটি বাংলাদেশের বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ স্তর।

২০২০

সরকারের এ তিনটি বিভাগের রূপরেখা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

আইন বিভাগ : বাংলাদেশের আইনসভা এক কক্ষবিশিষ্ট। এর নাম জাতীয় সংসদ। মোট ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে এটি গঠিত। এর মধ্যে ৩০০ জন সদস্য দেশের ৩০০ টি নির্বাচনি এলাকা থেকে নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। বাকি ৫০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা তাঁরা নির্বাচিত হয়ে থাকেন। অর্থাৎ সংরক্ষিত আসনের মহিলা সাংসদগণ পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। তবে ৩০০টি নির্বাচনি এলাকার যে কোনো আসনে মহিলারা সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে নির্বাচিত হতে পারেন। জাতীয় সংসদের মেয়াদ পাঁচ বছর। একজন স্পিকার জাতীয় সংসদের অধিবেশন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ডেপুটি স্পিকার তাঁকে এ কাজে সহায়তা করেন। এছাড়া স্পিকারের অনুপস্থিতিতে তিনি সংসদ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। দুজনই সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে ভোটে নির্বাচিত হন।

আইন সভা বা জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রের সাধারণ আইন তৈরি ও পরিবর্তন করে; দেশের জনমতকে প্রকাশ করে; সরকারের আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে; সংবিধান প্রণয়ন ও সংশোধন করে। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে আইন বিভাগ তা বিচার বিবেচনা করে। এছাড়া দেশের জাতীয় তহবিলের অভিভাবক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে। জাতীয় বাজেট অনুমোদন ও কর ধার্য করে।

শাসন বিভাগ : রাষ্ট্রের শাসন সংক্রান্ত কার্যাবলি পরিচালনার দায়িত্ব শাসন বিভাগের। ব্যাপক অর্থে, শাসন বিভাগ বলতে রাষ্ট্রের শাসন কাজে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিকে বোঝায়। এ অর্থে রাষ্টপ্রধান থেকে শুরু করে গ্রামের একজন চৌকিদার পর্যন্ত সকলেই শাসন বিভাগের অংশ। তবে প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান, মন্ত্রিপরিষদ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিয়েই শাসন বিভাগ গঠিত। শাসন বিভাগ আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন বাস্তবায়ন করে এবং সে অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করে। দেশের অভ্যন্তরে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে কাজ করে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে এবং বিদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে।

বিচার বিভাগ : সরকারের যে অঙ্গ বা বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধান ও আইন অনুযায়ী বিচার কাজ পরিচালনা করে থাকে তাকে বলা হয় বিচার বিভাগ। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিচারালয়ের বিচারকদের নিয়ে এ বিভাগ গঠিত। বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ স্তর হলো সুপ্রিম কোর্ট। এর প্রধানকে 'বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি' বলা হয়। রাষ্ট্রপতি তাঁকে নিয়োগ দেন। সুপ্রিম কোর্টের রয়েছে দুইটি বিভাগ। আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ। এই দুইটি বিভাগের বিচারপতিগণও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে বিচার কাজ পরিচালনা করে থাকেন।
২০২০ দুষ্টের দমন, অপরাধীর শাস্তি বিধান ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে নাগরিক জীবনকে সুন্দর ও সহজ

করে তোলে। বিভিন্ন দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা মোকদ্দমার মীমাংসামূলক রায় দেয়। সংবিধানের বিভিন্ন ধারা বা আইনের ব্যাখ্যা দেয়। দেশের সংবিধান ও নাগরিক অধিকার রক্ষা করে এবং বিভিন্ন ধরনের তদন্তমূলক কাজ করে।

উপরের আলোচনায় আমরা লক্ষ করেছি যে, সরকারের প্রতিটি বিভাগের নিজস্ব কাজ ও পরিধি আছে। সে অনুযায়ী বিভাগগুলো পরিচালিত হয়। সকল বিভাগের সম্মিলিত রূপই হলো সরকার এবং সকল বিভাগের কাজ সরকারি কাজের অন্তর্ভুক্ত।

কাজ-১: বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গের রূপরেখার একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি কর।

কাজ-২: নিচের ছকে সরকারের কয়েকটি কাজ উল্লেখ করা হয়েছে। কোনটি কোন বিভাগের কাজ চিহ্নিত কর ও নিচে লেখ।

কৃষির উন্নতির জন্য কাজ করে; মামলার মীমাংসামূলক রায় দেয়; আইন পরিবর্তন করে; দেশকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে; অপরাধীকে শাস্তি দেয়; সংবিধান প্রণয়ন করে।	
→ আইন বিভাগ :	১।
	২।
→ শাসন বিভাগ :	১।
	২।
→ বিচার বিভাগ :	১।
	২।

পাঠ- ৬: স্থানীয় সরকার কাঠামো ও কার্যাবলি

সাধারণভাবে স্থানীয় সরকার হলো স্থানীয় পর্যায়ে শাসন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার ব্যবস্থা। স্থানীয় সমস্যা স্থানীয়ভাবে সমাধানের লক্ষ্যেই মূলত স্থানীয় সরকার কাজ করে।

বর্তমানে রাষ্ট্রের আয়তন বড় ও লোকসংখ্যা বেশি হওয়ায় কেন্দ্রে বসে সরকারের পক্ষে দেশের সকল অঞ্চলের সকল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়ে উঠে না। তাই স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে এ ধরনের শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এতে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ কমে স্থানীয় সমস্যার সমাধানও সহজ হয়। এটি বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

২০২০

বাংলাদেশে গ্রাম ও শহরাঞ্চল উভয় ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার কাঠামো বিকশিত হয়েছে। পাশের ছকে উভয় অঞ্চলের স্থানীয় সরকারের কাঠামো দেখানো হলো।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে তিন স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামো চালু আছে। এর মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে আছে উপজেলা পরিষদ এবং জেলা পর্যায়ে আছে জেলা পরিষদ।

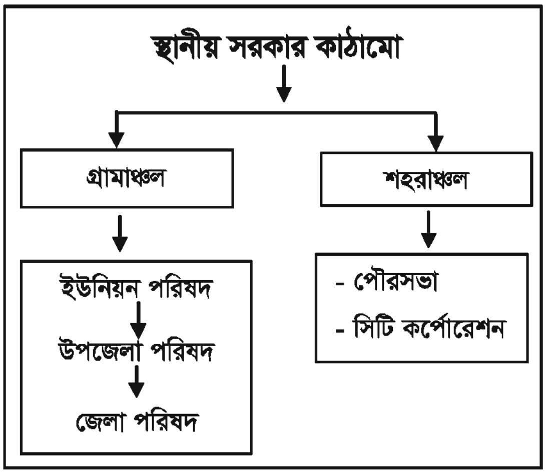

স্থানীয় সরকার কাঠামো

শহরাঞ্চলের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা দুই ধরনের-পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন। আটটি (০৮টি) বিভাগীয় শহর ছাড়াও কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও ময়মনসিংহে সিটি কর্পোরেশন রয়েছে এবং পৌরসভাগুলো অন্যান্য শহর এলাকায় স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব পালন করে।

স্থানীয় সরকারের গঠন

একমাত্র জেলা পরিষদ ছাড়া স্থানীয় সরকারের অন্য সকল কাঠামোর নেতৃত্বই নির্বাচিত হন জনগণের সরাসরি ভোটে। এগুলোর প্রতিটিরই কার্যকাল পাঁচ বছর।

ইউনিয়ন পরিষদ : স্থানীয় সরকারের প্রাথমিক স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ। দেশে বর্তমানে ৪,৫৫৪টি ইউনিয়ন পরিষদ আছে। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একেকটি ইউনিয়ন গঠিত। ইউনিয়ন পরিষদ হলো গ্রামীণ এলাকার স্থানীয় সরকার। গ্রামীণ সমস্যা দূরীকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্বের বিকাশ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি এর মূল লক্ষ্য। নির্বাচিত ১ জন চেয়ারম্যান, ৯টি ওয়ার্ড থেকে ৯ জন সদস্য ও সংরক্ষিত আসনে তিন জন মহিলা সদস্যসহ সর্বমোট ১৩ জন নিয়ে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত।

উপজেলা পরিষদ : কয়েকটি ইউনিয়ন নিয়ে একটি উপজেলা গঠিত হয়। একজন চেয়ারম্যান, একজন ভাইস চেয়ারম্যান, একজন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান এবং উপজেলার অন্তর্ভুক্ত সব ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং সকল মহিলা সদস্যের এক তৃতীয়াংশকে নিয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত হয়। দেশে বর্তমানে মোট উপজেলা পরিষদের সংখ্যা ৪৯২টি।

জেলা পরিষদ : কয়েকটি উপজেলা নিয়ে একটি জেলা গঠিত। দেশে ৬৪টি জেলা পরিষদের মধ্যে ৬১টি স্থানীয় সরকার বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে আছে। খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙামাটি এই তিনটি জেলা পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে। একজন চেয়ারম্যান এবং ২০ জন সদস্য নিয়ে জেলা পরিষদ গঠিত। ২০ জন সদস্যের মধ্যে পাঁচ জন হবেন মহিলা।

চেয়ারম্যানসহ সকলে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। জেলার অন্তর্গত সব মেয়র ও কমিশনার, সব উপজেলার চেয়ারম্যান, সব পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলর এবং সব ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ তাঁদের নির্বাচিত করেন। জেলার অন্তর্ভুক্ত সংসদ সদস্যগণ হবেন জেলা পরিষদের উপদেষ্টা।

পৌরসভা : শহর এলাকার স্থানীয় সরকার হিসাবে পৌরসভা গঠিত। বর্তমানে দেশে ৩২৭টি পৌরসভা আছে। একজন মেয়র, প্রতি ওয়ার্ড থেকে একজন করে কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের মহিলা কাউন্সিলরদের নিয়ে পৌরসভা গঠিত হয়। আয়তন ও জনসংখ্যার তারতম্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন পৌরসভার সদস্য সংখ্যা কম বা বেশি হতে পারে।

সিটি কর্পোরেশন : বাংলাদেশে ১২টি সিটি কর্পোরেশন আছে। ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, রংপুর, গাজীপুর এবং ময়মনসিংহ। প্রতিটিতে আছে একটি করে সিটি কর্পোরেশন। সিটি কর্পোরেশনের প্রধানকে বলা হয় মেয়র। মেয়রের কাজে সাহায্যের জন্য আছে কাউন্সিলর। সিটি কর্পোরেশনের আয়তনের ভিত্তিতে কাউন্সিলরদের সংখ্যা কম-বেশি হতে পারে।

কাজ : ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার গঠনের তুলনা একটি ছকের সাহায্যে দেখাও।

স্থানীয় সরকারের কাজ

স্থানীয় সরকার স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত ব্যবস্থা। এটি তাত্ত্বিক অর্থেও সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণমুক্ত। জনহিতকর কাজ থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায়ের অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে স্থানীয় সরকার। স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নের মূল দায়িত্ব স্থানীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে।

ইউনিয়ন পরিষদের কাজ

এলাকার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ অনেক দায়িত্ব পালন করে। যেমন :

- ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ;
- বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ;
- ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ;

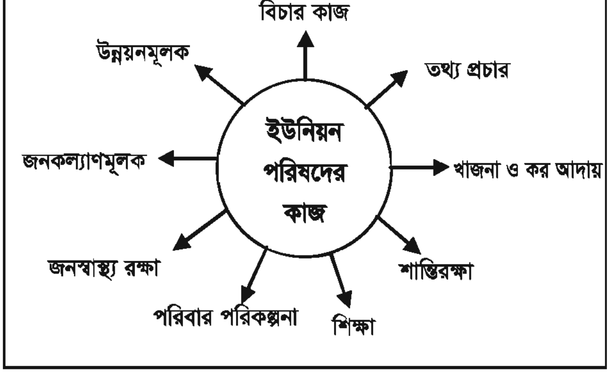

ছক : ইউনিয়ন পরিষদের কাজ

২০২০

- ইউনিয়নের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা ;
- প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা ;
- পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উপকরণ সহজলভ্য করার ব্যবস্থা ;
- গরিব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান, বয়স্কদের শিক্ষাদান, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ইত্যাদি ব্যবস্থা;
- এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ;
- এলাকায় জমির খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা ;
- এলাকায় কোনো অপরাধ বা দুর্ঘটনা ঘটলে পুলিশকে জানানো এবং অপরাধের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি;
- বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন : যৌন হয়রানি, যৌতুক প্রথা ইত্যাদির বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক কাজ করা;
- এলাকায় শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য বিবাদ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা।

উপজেলা পরিষদের কাজ : উপজেলা পরিষদের কাজ অনেকাংশে ইউনিয়ন পরিষদের কাজের মতো। এছাড়া উপজেলা পরিষদ পাঁচশালাসহ বিভিন্ন মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করে। সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও তার সমন্বয় সাধন করে। বিভিন্ন ইউনিয়নের মধ্যে সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে।

জেলা পরিষদের কাজ

জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনা করাই জেলা পরিষদের কাজ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: উপজেলা ও পৌরসভার সংরক্ষিত এলাকার বাইরে রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, আবাসিক হোস্টেল তৈরি, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, অনাথ আশ্রম নির্মাণ, গ্রন্থাগার তৈরি ও নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা, কৃষি খামার স্থাপন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ এবং পানি সেচের ব্যবস্থা করা। এছাড়াও জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের কাজ এবং জেলার যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নেও কাজ করে।

পৌরসভার কাজ

- বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা ;
- স্বাস্থ্যকর ও ভেজালমুক্ত খাদ্য বিক্রি নিশ্চিত করা ;
- শহরের পরিবেশ রক্ষার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা ;
- বিধি মোতাবেক ঘরবাড়ি নির্মাণের ব্যবস্থা করা ;
- সড়ক নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা ;
- রাস্তার দুই পাশে গাছ লাগানো, পার্ক ও উদ্যান প্রতিষ্ঠা ও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ সংরক্ষণ করা।

তাছাড়া পৌরসভা বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, এতিম ও দুঃস্থদের জন্য এতিমখানা পরিচালনা, লাইব্রেরি ও ক্লাব গঠন করা। ভিক্ষাবৃত্তি নিরোধ, খেলাধুলার ব্যবস্থা, মিলনায়তন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, জন্ম-মৃত্যু ও বিবাহ-নিবন্ধন, মহামারী ও সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ ও বিশিষ্ট অতিথিদের অভ্যর্থনা প্রদানের ব্যবস্থা করাও পৌরসভার কাজ।

সিটি কর্পোরেশনের কাজ :

- বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা ;
- স্বাস্থ্যকর ও ভেজালমুক্ত খাদ্য বিক্রি নিশ্চিত করা ;
- শহরের পরিবেশ রক্ষার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা ;
- সুষ্ঠুভাবে ঘরবাড়ি নির্মাণের ব্যবস্থা করা ;
- সড়ক নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা ;
- রাস্তার দুই পাশে গাছ লাগানো, পার্ক ও উদ্যান প্রতিষ্ঠা ও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।

কাজ- ১ : তোমার নিজ ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের কাজের বাস্তবায়ন পরিস্থিতি মূল্যায়ন কর। কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে না তা চিহ্নিত কর এবং প্রয়োজনীয় উন্নয়নের সুপারিশ কর। দলগতভাবে এ কাজটি করা যেতে পারে।

কাজ-২ : তোমার এলাকার স্থানীয় সরকারের কাজ বাস্তবায়নে তুমি কীভাবে সহযোগিতা করতে পার?

পাঠ- ৭ : সরকার পরিচালনায় সুশাসন

সরকার পরিচালনায় দক্ষতা অনেকাংশে সুশাসনের উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতপক্ষে যে সরকার দেশ পরিচালনায় সাংবিধানিক এবং আইনগত বিধিমালার অধীনে থেকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে, নাগরিক অধিকার রক্ষায় ও জনকল্যাণে সবচেয়ে বেশি সফলতার পরিচয় দেয় তাই সুশাসন।

সহজ কথায় সুশাসন হলো– দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র বা সরকার ব্যবস্থা যেখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজে দায়বদ্ধতা আছে। ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ বড় করে দেখা হয়। বিভিন্ন কাজ সম্পাদনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাই সুশাসনের নিয়ামক।

সরকার পরিচালনায় প্রশাসনে দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আইনের শাসন ও গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করতে দুর্নীতি, ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা ও স্বজনপ্রীতি বন্ধ করা প্রয়োজন। এছাড়া মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা দেশের জন্য জরুরি যাতে জনগণ সুবিচার পায়। দেশ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ, আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের জন্য শাসন ব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। দূর করতে হবে সুশাসনের প্রতিবন্ধকতা।

সরকার দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সুশাসনের উদ্যোগ বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে। নিজেদেরকে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম ধারক ও বাহক হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে সমৃদ্ধশালী ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ হিসাবে গঠনে আমাদের দায়িত্বশীল হতে হবে।

কাজ : বাংলাদেশের সরকার পরিচালনায় সুশাসনের গুরুত্ব চিহ্নিত কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের সংবিধান এ পর্যন্ত কতবার সংশোধন হয়েছে?

ক. ১১ খ. ১৩

গ. ১৬ ঘ. ১৭

২. রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি চারটি কোথায় লিপিবদ্ধ করা আছে?

ক. সংবিধানে খ. স্বাধীনতা সনদে

গ. আইন গ্রন্থে ঘ. সরকারি দলের গঠনতন্ত্রে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মিসেস তাসলিমা জাতীয় সংসদের একজন সদস্য। কিন্তু তিনি সংসদ নির্বাচনের সময় ৩০০ আসনের কোনোটিতেই প্রার্থী ছিলেন না। তিনি একজন নির্বাচিত সদস্য হিসাবে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে নারীর কোটা বৃদ্ধি বিল উত্থাপন করেন।

৩. কাদের ভোটে মিসেস তাসলিমা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলেন?

ক. জনগণের খ. সংসদ সদস্যদের

গ. মন্ত্রিপরিষদের ঘ. প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের

৪. মিসেস তাসলিমাকে সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচনের কারণ হচ্ছে–

i. মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করা

ii. সংসদের সদস্য সংখ্যা বাড়ানো

iii. নারীর স্বার্থ সংরক্ষণ করা

২০২৫

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii   খ. i ও iii

গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. গোলাম কুদ্দুস সাহেব হাটহাজারী উপজেলার রহিমপুর গ্রামের একজন বাসিন্দা। তিনি ২০১৫ সালে একটি স্থানীয় সরকারের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি এলাকাবাসীর বিশুদ্ধ পানির সমস্যা দূর করার জন্য তার এলাকায় ৫টি নলকূপ স্থাপন, রাস্তাঘাট সংস্কার ও নির্মাণ এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেন। ইতোমধ্যেই তিনি তাঁর এলাকায় একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ হিসাবে পরিচিতি পেয়েছেন।

ক. বাংলাদেশে জেলা পরিষদের সংখ্যা কত?

খ. 'জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস'– ব্যাখ্যা কর।

গ. গোলাম কুদ্দুস সাহেব কোন ধরনের স্থানীয় সরকারের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কুদ্দুস সাহেবকে চেয়ারম্যান হিসাবে উল্লিখিত দায়িত্ব ছাড়াও আরও অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়- বক্তব্যটির যথার্থতা নিরূপন কর।

২০২১

অষ্টম অধ্যায়

বাংলাদেশের দুর্যোগ

বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলির একটি। আমরা জানি যে, ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা উষ্ণায়নের কারণে সারা পৃথিবীতেই আজ জলবায়ুর পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। জলবায়ুর এই পরিবর্তনের ফলে উষ্ণমণ্ডলীয় দেশে শুষ্ক মৌসুমে ফসলের উৎপাদন হ্রাস পায়। এছাড়া বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, বন্যা ও জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। শুষ্ক মৌসুমে অনাবৃষ্টি ও অত্যধিক খরা, শিলাবৃষ্টি, ভূমিক্ষয়, টর্নেডো, সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে এবং উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়। শীত মৌসুমে হঠাৎ শৈত্য ও উষ্ণ প্রবাহ এবং ঘন কুয়াশা লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া এ দেশে সংগঠিত প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহের মধ্যে ভূমিকম্প অন্যতম। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এ দুর্যোগ সংগঠনের কারণ। বাংলাদেশের জীবন ও অর্থনীতির উপর এইসব দুর্যোগের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- দুর্যোগের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- দুর্যোগের ধরন উল্লেখ করতে পারব;
- বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথা- ভূমিকম্প, সুনামি, ভূমিধস ও অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের জীবন ও অর্থনীতির উপর এসব দুর্যোগের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ, দুর্যোগে করণীয়, জীবন ও জীবিকা রক্ষায় উপযোগী পদক্ষেপের পরামর্শসহ পরিকল্পনা তৈরি করতে পারব;
- পরিবেশ বিষয়ে সচেতন হব।

পাঠ-১ : বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ধারণা

পৃথিবীর বুকে উদ্ভিদ ও প্রাণীর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে পানি, বায়ু ও অন্যান্য উপাদানের সমন্বয়ে গড়ে উঠা প্রাণ-উপযোগী পরিবেশের কারণে। উষ্ণায়নের ফলে সেই পরিবেশই ভয়ানকভাবে বিপন্ন হচ্ছে। এখন জানা যাক, এই 'উষ্ণায়ন' কী। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষ একদিকে যেমন তার জীবনকে করেছে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় অন্যদিকে তেমনি পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশকে করেছে ক্ষতিগ্রস্ত ও ভারসাম্যহীন। জনসংখ্যার বিস্ফোরণ, বৃক্ষনিধন ও ইঞ্জিনচালিত

যানবাহনসহ বড় বড় শিল্প-কারখানার কারণে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে সৃষ্টি হয় নানা সমস্যার। সমস্যাগুলোর একটি হলো 'গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া'। এটি একটি জটিল সমস্যা। গ্রিনহাউস মূলত কতগুলো গ্যাসের সমন্বয়ে গঠিত একটি আচ্ছাদন। গ্রিনহাউস গ্যাসকে তাপ বৃদ্ধিকারক গ্যাসও বলে। এই গ্যাস পৃথিবীর চারপাশে বায়ুমণ্ডলে চাদরের মতো আচ্ছাদন তৈরি করে আছে।

পাশের চিত্রটি লক্ষ কর। এখানে গ্রিনহাউস গ্যাস পৃথিবীকে ঘিরে চাদরের মতো একটি আচ্ছাদন তৈরি করেছে। তার ফল কী হয়েছে? সূর্যের তাপ এই চাদর শোষণ করে এবং তা পৃথিবীপৃষ্ঠে ছড়িয়ে দেয়। পৃথিবী পৃষ্ঠ দ্বারা গৃহীত এ তাপমাত্রা স্বাভাবিকভাবে রাতের বেলা প্রতিফলিত হয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে যায় এবং এভাবেই পৃথিবী ঠান্ডা হয়। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে নির্দিষ্ট কিছু গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিফলিত তাপ সম্পূর্ণভাবে মহাশূন্যে মিলিয়ে না যেয়ে বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে। এভাবেই পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে। একেই বলা হয় বৈশ্বিক উষ্ণায়ন। এই উষ্ণায়নের ফলে বায়ুমণ্ডল ও পৃথিবী ক্রমাগত উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। সমুদ্র পৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বাড়ছে।

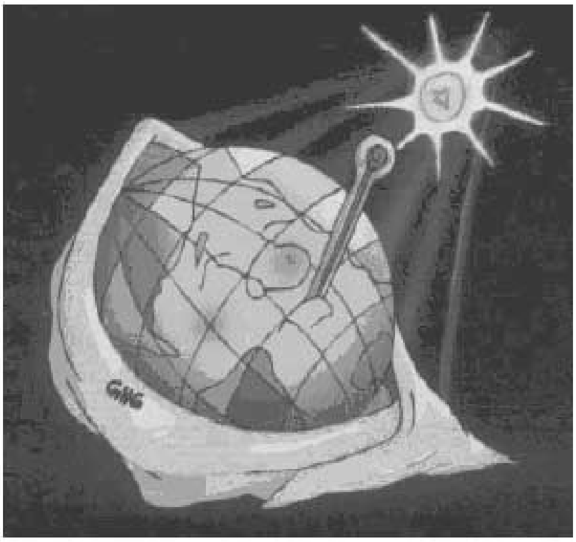

পৃথিবীকে ঘিরে গ্রিনহাউস গ্যাসের চাদর

পাঠ- ২ : বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণ ও প্রভাব

বায়ুর মূল উপাদান হলো নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন। এছাড়া বায়ুতে সামান্য পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইড আছে। আরও আছে জলীয় বাষ্প ও ওজোন গ্যাস। বায়ুমণ্ডলের এই গৌণ গ্যাসগুলোকেই গ্রিনহাউস গ্যাস বলা হয়। প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট এসব গ্যাস ছাড়াও মনুষ্য সৃষ্ট সিএফসি (ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন), এইচসিএফসি (হাইড্রো ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন), হ্যালন ইত্যাদিও গ্রিনহাউস গ্যাস। এই গ্যাসগুলোর মধ্যে গত এক শতাব্দীতে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে শতকরা ২৫ ভাগ। একইভাবে নাইট্রাস অক্সাইডের পরিমাণও শতকরা ১৯ ভাগ এবং মিথেনের পরিমাণ ১০০ ভাগ বেড়েছে। যা বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রধান কারণ। এছাড়া অন্যান্য কারণও রয়েছে।

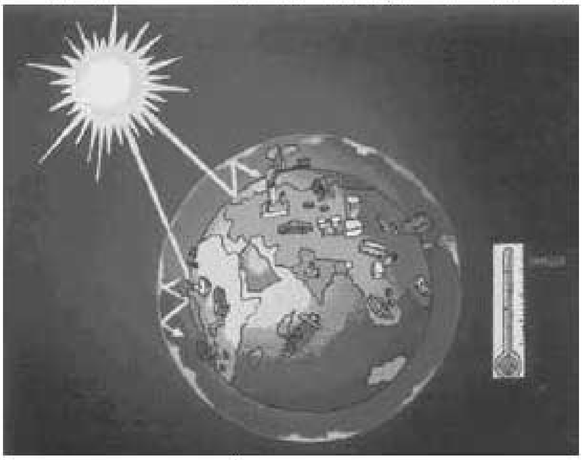
গ্রিনহাউস গ্যাস ভূপৃষ্ঠের চারপাশে জমা হচ্ছে এবং তার ফলে তাপ বাড়ছে

আমরা যেসব দ্রব্য ব্যবহার করি, যেমন রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার, প্লাস্টিক, ফোম, এরোসল প্রভৃতির ফলেও বায়ুমণ্ডলে উৎপন্ন হচ্ছে এক ধরনের গ্রিনহাউস গ্যাস (এইচসিএফসি)। এই গ্যাসের কারণে বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বায়ুমণ্ডলের অনেকগুলো স্তর আছে। তার মধ্যে ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী স্তর ট্রপোস্ফেয়ার। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যার গড় উচ্চতা ১২ কি.মি.। এর পরের স্তর হলো স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার। তারপরের স্তরটি হলো ওজোন স্তর, যা ২০ কি. মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। ওজোন স্তর সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে পৃথিবীর জীবজগতকে রক্ষা করে। ওজোন স্তর ক্ষয়ের কারণে ভূপৃষ্ঠে অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাব শতকরা পাঁচ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটাও বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ার কারণ।

কালো ধোঁয়া

বিশ্বের উন্নত দেশগুলো অধিক হারে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে পরিবেশ নষ্ট করছে। তাছাড়া এসব দেশ পারমাণবিক চুল্লি ব্যবহার করে, যা থেকে প্রচুর বর্জ্য সৃষ্টি হয়। এই বর্জ্যও গ্রিনহাউস গ্যাস বৃদ্ধি করছে, তবে বৈশ্বিক উষ্ণায়নে এর ভূমিকা অতি সামান্য। শিল্প-কারখানার বর্জ্য ও কালো ধোঁয়া থেকেও প্রচুর পরিমাণে পারদ, সিসা ও আর্সেনিক নির্গত হয়। এটাও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণ।

সমুদ্রে বর্জ্য ফেলা ও কালো ধোঁয়া উদগীরণ

মহাসমুদ্রকে পৃথিবীর মানব দেহের ফুসফুসের সাথে তুলনা করা যায়। বিশ্বের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে মহাসমুদ্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু সমুদ্রে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নিক্ষেপ করার ফলে তা দূষিত হচ্ছে এবং এ দূষিত বাষ্প বাতাসে মিশ্রিত হয়েও বৈশ্বিক উষ্ণায়নে ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র একটি দেশেও এক সময় বহু নদী-নালা, খাল-বিল ও হাওর-বাওর ছিল যা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখত। এখন এসব নদী-খাল-বিল শুকিয়ে গিয়েছে কিংবা ভরাট করে ফেলা হয়েছে। অনেক নদী ও খাল বর্জ্য ফেলার কাজে ব্যবহৃত হয়। এভাবে অনেক অনুন্নত দেশেই এসব নদ-নদীর অপব্যবহার হওয়ায় বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়।

বন উজাড় হওয়া

পরিবেশ দূষণের পিছনে যে কারণটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো বন উজাড়করণ। আমরা জানি, সবুজ উদ্ভিদ বাতাস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং আমাদের জন্য অক্সিজেন ত্যাগ করে। কিন্তু ব্যাপকহারে বৃক্ষ নিধন বা বন উজাড়করণের ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেছে। ফলে বায়ুমণ্ডলে ওজোন স্তর ক্ষয়কারী সিএফসি গ্যাস অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে ব্যাপক হারে নগর গড়ে উঠেছে। মানুষ কাজের খোঁজে শহরে ছুটছে। ফলে শহরে জনসংখ্যার চাপ ও বিভিন্ন প্রকার যানবাহনের সংখ্যা বাড়ছে। এসব যানবাহনের নির্গত কালো ধোঁয়া হচ্ছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড। তাছাড়া শিল্প-কারখানার কালো ধোঁয়াও নগরের বায়ুতে কার্বনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। এটিও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির একটা কারণ।

যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি

কৃষিতে যান্ত্রিক সেচ, নাইট্রোজেন সার, কীটনাশক প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। এসবের ফলেও বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার প্রভাবে বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ছে।

আমরা সপ্তম শ্রেণিতে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে জেনেছি। জলবায়ু পরিবর্তনের একটি প্রধান কারণ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন। এর ফলে পৃথিবীর সর্বত্র আজ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশও তা থেকে মুক্ত নয়। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে বাংলাদেশে পরিবেশ ও জীবনযাত্রায় যেসব ক্ষতি হতে পারে তা হলো :

কৃষিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার

সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার ফলে উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহে সমুদ্রের পানি ঢুকে পড়ে। আর সমুদ্রের লবণাক্ত পানির প্রভাবে গাছপালা, মৎস্যখামার ও শস্যক্ষেতের ক্ষতি হয়। ইতোমধ্যেই এর প্রভাব লক্ষ করা গেছে। বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহের ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে। উপকূলীয় এলাকার কৃষি জমিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। জমির উর্বরাশক্তি কমে গেছে। এ কারণে এসব অঞ্চলে কৃষি উৎপাদনও কমে গেছে। অনেক রকম মিঠা পানির মাছ হারিয়ে যাচ্ছে। ধ্বংস হচ্ছে গাছপালা। এর প্রভাব পড়ছে মানুষের জীবন-জীবিকার উপর। জীবিকার টানে মানুষ শহরমুখী হয়। শহরের উপরও চাপ বাড়ছে।

সমুদ্রের পানি বৃদ্ধির কারণে স্বাভাবিকের তুলনায় উঁচু জোয়ারের সৃষ্টি হয়। যা জলোচ্ছ্বাসের আকার ধারণ করে। আবার সমুদ্রে নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ার কারণে সাইক্লোনের তীব্রতা বেড়ে যায়। আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ 'আইলা' ও 'সিডর' এর নাম শুনেছি। এ দুটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আমাদের দেশের উপকূলবর্তী এলাকায় প্রাণহানি ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। খাবার পানির তীব্র অভাব দেখা দেয়। ইতোমধ্যে সুন্দরবনের প্রায় এক-চতুর্থাংশে বন নষ্ট হয়েছে। এর ফলে জীববৈচিত্র্য ও মৎস্য সম্পদের ক্ষতি হয়েছে।

উষ্ণায়নের কারণে পৃথিবীপৃষ্ঠে তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি সরাসরি পৃথিবীতে আসার ফলে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর বিভিন্ন প্রকারের মারাত্মক রোগ সৃষ্টি হয়। ক্যান্সার, চর্মরোগসহ নানা ধরনের নতুন নতুন রোগের আবির্ভাব ঘটে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। যেমন-বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ইতোমধ্যে মরুকরণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

উষ্ণায়নের ফলে সৃষ্ট বন্যা, খরা, লবণাক্ততা প্রভৃতি কারণে গবাদি পশুর খাদ্যের অভাব হবে। বাড়বে বিভিন্ন ধরনের রোগ। এসব ক্ষতিকর প্রভাব বিবেচনা করে আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ মোকাবিলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

কাজ- ১ : বৈশ্বিক উষ্ণায়ন কী কী কারণে ঘটে, উল্লেখ কর।

কাজ- ২ : বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে মানুষ, পরিবেশ ও জীবজন্তুর কী কী ক্ষতি হয় এবং হতে পারে? উল্লেখ কর।

পাঠ-৩ : দুর্যোগের ধারণা ও ধরন

কোনো প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট অবস্থা যখন অস্বাভাবিক ও অসহনীয় পরিবেশের সৃষ্টি করে এবং এর ফলে শস্য ও সম্পদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি ও ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে, পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন তাকে দুর্যোগ হিসাবে বিবেচনা করা যায়। দুর্যোগ দুই ধরনের। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মানবসৃষ্ট দুর্যোগ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ আকস্মিকভাবে ঘটে এবং তার উপর সাধারণত মানুষের হাত থাকে না। কিন্তু মানবসৃষ্ট দুর্যোগ অনেকটা মানুষের কর্মকাণ্ডের ফল এবং মানুষ সচেতন ও সতর্ক থাকলে তা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। মানুষের অসচেতনতা বা দূরদৃষ্টির অভাবে যে দুর্যোগ সৃষ্টি হয় এবং যা মানুষের প্রাণহানি ঘটানোর পাশাপাশি তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে, পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করে এবং সমাজকে অস্থিতিশীল করে তোলে, তাকে মানবসৃষ্ট দুর্যোগ বলে। যেমন : যুদ্ধ-বিগ্রহ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বনভূমি বিনাশ, নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি, মরুকরণ, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি। অন্যদিকে প্রাকৃতিক কোনো দুর্ঘটনা বা বিপর্যয় যখন কোনো জনপদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে তোলে তখন তাকে আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলি। যেমন- বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, ভূমিকম্প, খরা, নদীভাঙন, সুনামি, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি।

কাজ- ১ : দুর্যোগ কাকে বলে?

কাজ- ২ : প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের ৫টি করে উদাহরণ দাও।

পাঠ- ৪ ও ৫ : বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ

সপ্তম শ্রেণিতে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা জেনেছি। এ পাঠে আমরা আরও কয়েকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে জানব। এছাড়া এ পাঠে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কে জানব।

ভূমিকম্প

ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত বাড়িঘর

পৃথিবীতে যত রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে তার মধ্যে ভূমিকম্পই সবচেয়ে অল্প সময়ে সবচেয়ে বেশি ধ্বংসযজ্ঞ ঘটায়। ভূমিকম্পের ব্যাপারে কোনো আগাম সতর্ক সংকেত দেওয়া সম্ভব নয়। ভূমিকম্পের সময় কিছু বুঝে উঠার আগেই একটি বা কয়েকটি ঝাঁকুনিতে পুরো এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। একই স্থানে সাধারণত পর পর কয়েকবার বড়, মাঝারি ও মৃদু ধরনের ভূমিকম্প হতে পারে। ইরান, চীন, মেক্সিকো, চিলি ও জাপানের ভূমিকম্পে আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি। বাংলাদেশ ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। বিশেষ করে ঢাকা, সিলেট, রংপুর ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই ঝুঁকি বেশি। চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে ইদানীং প্রায়ই মৃদু ভূমিকম্প হচ্ছে। ২০১১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর সংগঠিত ভূমিকম্পটি ছিল বেশ প্রচণ্ড। এ ভূমিকম্পে সারা বাংলাদেশ কেঁপে উঠে। ভূমিকম্প প্রতিরোধের কোনো ব্যবস্থা এখনও মানুষের জানা নেই। তবে ভূমিকম্পের সময় আত্মরক্ষা এবং ভূমিকম্পের পর উদ্ধার ও ত্রাণকাজ সম্পর্কে মানুষকে ধারণা দিতে হবে।

সুনামি

সুনামি একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের নাম। এটি মূলত জাপানি শব্দ। যার অর্থ হলো 'সমুদ্র তীরের ঢেউ'। সমুদ্রের তলদেশে প্রচণ্ড ভূমিকম্প বা অগ্ন্যুৎপাতের ফলে, কিংবা অন্য কোনো কারণে, ভূআলোড়নের সৃষ্টি হলে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে প্রবল ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। এই প্রবল ঢেউ উপকূলে এসে তীব্র বেগে আছড়ে পড়ে। এই সামুদ্রিক ঢেউয়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ৮০০ থেকে ১৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। সুনামির কারণে সমুদ্রের পানি জলোচ্ছ্বাসের আকারে ভয়ঙ্কর গতিতে উপকূলের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে। এর ফলে স্বল্প সময়ের মধ্যেই উপকূলের ঘর-বাড়ি, দালান, রেলপথ, রাস্তাঘাট, বৈদ্যুতিক যোগাযোগ-ব্যবস্থা, বাণিজ্য কেন্দ্র প্রভৃতি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

সুনামি

২০১১ সালে জাপানের উত্তর-পূর্ব এলাকায় ভয়াবহ সুনামি সংগঠিত হয়। ৮.৯ মাত্রার ভূমিকম্পে এই সুনামি সৃষ্টি হয়। জাপানের রাজধানী টোকিও শহরের প্রায় ৪০০ কিলোমিটার উত্তরপূর্বে এই সুনামি আঘাত হেনেছিল। এর ফলে জাপানের পাঁচটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব বিদ্যুৎকেন্দ্রের পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তা বাতাস ও পানির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, যা মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকির সৃষ্টি করে। সুনামির সময় হাজার হাজার ট্রেনযাত্রী নিখোঁজ হয়। জাহাজ সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যায়।

ভূমিধস

পাহাড়ের মাটি ধসে পড়াকেই ভূমিধস বলা হয়। যেসব পাহাড় বেলে পাথর বা শেল কাদা দিয়ে গঠিত ভারি বৃষ্টিপাত হলে সেসব পাহাড়ে ভূমিধস ঘটতে পারে। সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি ও ভারি বৃষ্টিপাতের কারণেই ভূমিধস ঘটে থাকে। তাছাড়া মানুষ ব্যাপকহারে গাছপালা ও পাহাড় কেটে ভূমিধসের কারণ ঘটায়। ভূমিধসের ফলে যারা পাহাড়ের পাদদেশে বসবাস করে তাদের ঘরবাড়ি মাটির নিচে চাপা পড়তে পারে। আমাদের দেশে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, সিলেট, নেত্রকোনা প্রভৃতি জেলায় প্রায়ই ভূমিধস হয়ে মানুষের প্রাণহানি ঘটে ও বাড়িঘর নষ্ট হয়।

ভূমিধস

অগ্নিকাণ্ড বা দাবানল

অগ্নিকাণ্ড যেমন প্রাকৃতিক কারণে ঘটে তেমনি মানুষের অসাবধানতার ফলে বা দুর্ঘটনাজনিত কারণেও ঘটতে পারে। প্রচণ্ড দাবদাহের কারণে কোনো কোনো দেশে বনাঞ্চলে অগ্নিকাণ্ড ঘটতে দেখা যায়। একে দাবানল বলে। এর ফলেও বৃক্ষসম্পদ নষ্ট হয়। নষ্ট হয় জীববৈচিত্র্য।

আমাদের দেশে দাবানলের ঘটনা সাধারণত ঘটে না। কাজেই আমাদের দেশে অগ্নিকাণ্ডকে ঠিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলা যাবে না। এখানে দুর্ঘটনা বা মানুষের অসাবধানতাই অগ্নিকাণ্ডের কারণ। দুর্ঘটনাজনিত অগ্নিকাণ্ড সাধারণত শিল্পকারখানা, তেলশোধনাগার, গার্মেন্টস শিল্প, পাটকল, রাসায়নিক গুদাম বা কারখানা, এমনকি বসতবাড়ি, দোকানপাট, অফিস ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে

২০২০

ঘটতে দেখা যায়। ঢাকার নিমতলিতে রাসায়নিক গুদাম থেকে সৃষ্ট অগ্নিকাণ্ডে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটেছে, অনেকে পঙ্গু হয়ে পড়েছে, অনেক পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। এছাড়াও আমাদের দেশে গ্রাম ও শহরাঞ্চলে জ্বলন্ত চুলা, কুপি, মশার কয়েল, সিগারেটের আগুন, হারিকেন প্রভৃতি থেকেও অসাবধানতাবশত অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটে।

অগ্নিকাণ্ড

কাজ-১ : বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগের নাম উল্লেখ কর।

কাজ-২ : প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের উৎস ও প্রভাব উল্লেখ কর।

পাঠ- ৬ : প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মূলত প্রাকৃতিক কারণে ঘটে থাকে। একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ুগত প্রভাব, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন তথা সামগ্রিক প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে এ দুর্যোগ ঘটে থাকে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, ভূমির গঠন, নদী-নালা ইত্যাদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

ভৌগোলিক অবস্থান : ভৌগোলিক অবস্থানই আমাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগের অন্যতম কারণ। নদীমাতৃক প্রায় সমতল এদেশটির উত্তরে হিমালয় পর্বত এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এ দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীসমূহের উৎস হয় ভারতে না হয় নেপালে। দক্ষিণাঞ্চলে পাহাড়, পর্বত, টিলা বা এমন কোনো প্রাকৃতিক বাধা নেই যা ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাসে স্বাভাবিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।

ভূমির গঠন : বাংলাদেশের অধিকাংশ ভূভাগ প্লাবন সমভূমি দ্বারা গঠিত। এছাড়া ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমার প্লেটের (পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিদ্যমান বিশাল পাত) সীমানার কাছে অবস্থিত হওয়ায় এদেশ ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত।

জলবায়ু : বাংলাদেশ ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থান করায় এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এর ফলে এখানে বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে।

নদী-নালা : বাংলাদেশের উপর দিয়ে অসংখ্য নদী-নালা আঁকাবাঁকা হয়ে প্রবাহিত হওয়ায় এখানে বন্যা ও নদীভাঙনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে।

কাজ : মানচিত্রে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ ভিত্তিক দুর্যোগ এলাকা চিহ্নিত কর।

পাঠ-৭ : বাংলাদেশের জীবন ও অর্থনীতির উপর দুর্যোগের প্রভাব

প্রাকৃতিক এবং মানব সৃষ্ট দুর্যোগ যে কোনো দেশ বা সমাজের জন্য ভয়াবহ ও ক্ষতিকর। এ দুর্যোগ মানুষের জীবন ও অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বাংলাদেশে প্রায় প্রতিবছরই কমবেশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ে থাকে। এর মধ্যে বন্যা অন্যতম। ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০২, ২০০৪ ও ২০০৯ সালের সংগঠিত বন্যা ছিল ভয়াবহ। এসব বন্যার কারণে ক্ষেতের ফসল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু, গাছপালা, মাছের খামার, শিল্প-কারখানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। তাছাড়া বন্যার কারণে বাড়িঘর ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধন হয়েছিল। প্রায় প্রতি বছর আমাদের দেশে সাধারণত শতকরা ২০ ভাগ এলাকা বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়। কিন্তু দুর্যোগ অস্বাভাবিক আকার ধারণ করলে দেশের শতকরা ৬৮ ভাগ এলাকাও ডুবে যাওয়ার আশংকা থাকে। বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগের সময় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়– আমাদের দেশের নারী, শিশু, বয়োবৃদ্ধ এবং প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী। বন্যা ও বন্যা পরবর্তীকালীন সময়ে খাবার তৈরি, পানি সংগ্রহ, নির্ভরশীল সন্তানদের পরিচর্যাসহ বৃদ্ধদের নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রে নারীরাই অধিক ভূমিকা রাখে। ফলে তাদের এসব সমস্যা মোকাবিলায় নানামুখী বাধার সম্মুখীন হতে হয়। বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগের কারণে এদেশের দরিদ্র মানুষই অধিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। দরিদ্রতার কারণে অধিকাংশ জনগোষ্ঠী প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার সামর্থ্য হারায়। তাছাড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই সাধারণত দুর্যোগের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাস করে বলে দুর্যোগের প্রথম শিকার হয় তারা।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বায়ু ও পানি দূষিত হয়, যা জনজীবনের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো প্রভৃতি দুর্যোগের ফলে আবর্জনা, জীবজন্তুর মরদেহ, মলমূত্র প্রভৃতি আমাদের আশেপাশের পানি ও বায়ুকে দূষিত করে। ফলে বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়।

দুর্যোগজনিত পানি দূষণের কারণে ডায়রিয়া, আমাশয়, জন্ডিস, চর্মরোগ, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়াসহ বিভিন্ন ধরনের অসুখ দুর্যোগ কবলিত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় মানুষ পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হয়। তবে দুর্যোগকালীন নারী, শিশু ও বৃদ্ধরা অধিক দুর্ভোগের শিকার হয়।

২০০৭ সালে সংগঠিত সিডর এবং ২০০৯ সালের আইলায় আক্রান্ত বাংলাদেশের উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ সহায়সম্বল হারিয়ে আর্থ-সামাজিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এসব বিপর্যয়ে হাজার হাজার মানুষ বসতবাড়ি, সহায়-সম্বল হারিয়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয়। এ ধরনের দুর্যোগে অনেক প্রাণহানি এবং প্রচুর ফসলহানি হয়। আমাদের দেশে শহরকেন্দ্রিক বস্তি গড়ে উঠার

একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাসের সময় প্রবল বাতাসে উপকূলীয় গাছপালার অনেক ক্ষতি হয়। আবার জলোচ্ছ্বাসের কারণে জমিতে লবণাক্ততা বেড়ে যায় ফলে অনেক মাছ মারা যায়। এই লবণাক্ত পানির কারণে জমির উর্বরাশক্তি কমে যায় এবং এসব জমিতে ফসল হয় না। তাছাড়া লবণাক্ত পানির কারণে মিঠাপানির মাছের প্রজাতি ধ্বংস হয়ে যায়। নদী ভাঙ্গনেও অনেক বনাঞ্চল নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় যা প্রকৃতির ভারসাম্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

কাজ : দুর্যোগ আমাদের পারিবারিক জীবনের উপর কী প্রভাব ফেলছে তা চিহ্নিত কর।

পাঠ- ৮ : দুর্যোগ মোকাবিলায় করণীয়

আমরা আগেই জেনেছি, ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল। এদেশের মানুষ যুগ যুগ ধরে দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোধ করা যায় না, তবে উপযুক্ত পূর্বপ্রস্তুতি এবং কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে এসব দুর্যোগে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।

বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় করণীয়

দুর্যোগপূর্ব করণীয়

১. যথাসম্ভব উঁচু জায়গায় বসতভিটা, গোয়ালঘর ও হাঁস-মুরগির ঘর তৈরি করতে হবে।

২. নদী তীরবর্তী এলাকায় বেড়ি বাঁধের ভিতরে এবং সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে বেস্টনির ভিতরে বসতভিটা তৈরি করতে হবে।

৩. বাড়ির চারপাশে বাঁশঝাড়, কলাগাছ, ঢোলকলমি, ধৈঞ্চা ইত্যাদি গাছ লাগাতে হবে। এসব গাছ বন্যার স্রোত অনেকটা প্রতিরোধ করতে পারে।

৪. ঘরের ভিতরে উঁচু মাচা বা পাটাতন তৈরি করে তার উপর খাদ্যশস্য, বীজ ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে ঘরে পানি ঢুকলেও এগুলো নষ্ট না হয়।

৫. প্রতিটি পরিবারে দা, খুন্তি, কুড়াল, কোদাল, ঝুড়ি, নাইলনের দড়ি, বাঁশের চাটাই, টিনের ভাঙা টুকরা, আলগা চুলা, রেডিও, টর্চ লাইট ও ব্যাটারি জোগাড় করে রাখতে হবে।

বাড়ির চারপাশে ঢোলকলমি ও কলাগাছ লাগানো হয়েছে

২০২০

৬. পুকুরের পাড় উঁচু করতে হবে এবং টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিন যতটা সম্ভব উঁচু স্থানে বসাতে হবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত পাইপ লাগিয়ে টিউবওয়েলের মুখ উঁচু করতে হবে।

৭. শুকনা খাবার যেমন চিড়া, মুড়ি, খৈ, গুড় এবং প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র বিশেষ করে খাবার স্যালাইন ঘরে মওজুদ রাখতে হবে। দুর্যোগকালীন সময়ের জন্য কিছু পরিমাণ গোখাদ্যও সংরক্ষণ করতে হবে।

দুর্যোগপূর্ব সতর্কীকরণ

৮. পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে সাঁতার শেখার ব্যাপারে উৎসাহী করতে হবে।

৯. বন্যা বা ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের মৌসুমের আগে বসতভিটা মেরামত বিশেষ করে খুঁটি মজবুত করতে হবে।

১০. নিকটবর্তী আশ্রয় কেন্দ্রের খোঁজ রাখতে হবে।

১১. সঞ্চয়ের মনোভাব গড়ে তুলতে হবে।

১২. সতর্ক-সংকেত ও তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানতে হবে।

১৩. এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে।

১৪. এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ, রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট ইত্যাদি মেরামতের জন্য সামাজিকভাবে উদ্যোগী হতে হবে।

সামাজিক কমিটি

১৫. এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, সামাজিক কমিটি, স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়মিত সভা করে দুর্যোগ প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে এলাকাবাসীকে সচেতন করতে হবে।

দুর্যোগকালীন করণীয়

১. বন্যা শুরু হলে নিয়মিতভাবে পানি বাড়া বা কমা পর্যবেক্ষণ কিংবা এসম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখতে হবে। ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাসের প্রতি মনোযোগী হতে হবে।

দুর্যোগে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়া

২. বন্যার সময় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পলিথিন বা পানিরোধক প্যাকেটে মুড়ে ঘরের চালের নিচে পাটাতনে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস পাবার সঙ্গে সঙ্গে খাবার পানি কলসিতে ভরে ভালো করে ঢেকে পলিথিন দিয়ে বেঁধে এবং সেই সাথে কিছু

শুকনো খাবার যেমন চিড়া, মুড়ি, গুড় একটি পাত্রে ভরে ভালো করে পলিথিন বা প্লাস্টিক ব্যাগে মুড়ে মাটির নিচে পুঁতে রাখতে হবে।

৩. গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগিগুলোকে উঁচু স্থানে সরিয়ে রাখতে হবে।

৪. বন্যায় বাড়িঘর ডুবে গেলে নিকটস্থ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিতে হবে। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ক্ষেত্রে ১, ২, ৩ ও ৪ নং সতর্ক-সংকেত পর্যন্ত আশ্রয়কেন্দ্রে যাবার প্রয়োজন নেই। তবে ৫নং বিপদসংকেত শোনার পর শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ও মেয়েদের আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিতে হবে এবং মহাবিপদ সংকেত শোনার পর সবাইকে অবশ্যই আশ্রয়কেন্দ্রে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে। আশ্রয়কেন্দ্র না থাকলে কাছাকাছি পাকা, উঁচু বা বহুতল বাড়ি, স্কুল-কলেজ বা অন্য প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় নিতে হবে।

৫. দুর্যোগে বিশুদ্ধ বা নিরাপদ পানি পান করতে হবে। যে টিউবওয়েলের মুখ পানিতে ডোবেনি এমন টিউবওয়েলের পানি পানের জন্য নিরাপদ। প্রয়োজনে পানি ভালোভাবে ফুটিয়ে কিংবা পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট বা ফিটকারি ব্যবহার করে পান করতে হবে।

দুর্যোগের সময়ে নিরাপদ পানি পান

৬. যে কোনো দুর্যোগের সময় ছোট শিশুদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। অসুস্থ, প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী নারী ও বৃদ্ধদের প্রতি অধিক যত্নশীল হতে হবে।

৭. বন্যাকালীন সময়ে যাতায়াতের জন্য নৌকা না থাকলে কলাগাছের ভেলা তৈরি করে নিতে হবে।

৮. পরিবারের সকল সদস্যকে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের টিকা নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. আশ্রয়কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সামাজিকভাবে উদ্যোগী হতে হবে।

১০. আশ্রয়কেন্দ্রে ল্যাট্রিন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা যাতে যথাযথ থাকে সে ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে।

১১. নিজের সুযোগ-সুবিধাকে বড় করে না দেখে, সবার প্রতি সহানুভূতিশীল ও মানবিক আচরণ করতে হবে।

দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে করণীয়

১. বন্যার পানি নেমে গেলে বা ঝড় পুরোপুরি থেমে গেলে আশ্রয়কেন্দ্র ছেড়ে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যেতে হবে।

২. ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে ঝড় থেমে যাবার পর পরই আশ্রয়কেন্দ্র ছেড়ে যেতে নেই। কারণ একবার ঝড় থেমে যাবার কিছুক্ষণ পর আবার উল্টো দিক থেকে তীব্র বেগে ঝড় প্রবাহিত হয়ে আঘাত হানতে পারে। দেখা গেছে উল্টো দিকের ঝড়ে জলোচ্ছ্বাসের পানি তীরের সবকিছু সমুদ্রের বুকে টেনে নেয়।

৩. ঘরবাড়ি পরিষ্কার ও মেরামত করে বাসযোগ্য করে তুলতে হবে, এজন্য প্রয়োজনে ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করতে হবে।

৪. দুর্যোগে কেউ আহত হলে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হবে। আঘাত গুরুতর হলে দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নিতে হবে এবং সেখানে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. কোনো ব্যক্তি মারা গেলে, লাশ উদ্ধার করে যত দ্রুত সম্ভব তা সমাহিত করার ব্যবস্থা করতে হবে। মৃত পশুপাখিও মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

৬. বাইরে থেকে ত্রাণ ও চিকিৎসক দল এলে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরা যাতে সাহায্য পায় সে ব্যাপারে সহযোগিতা করতে হবে।

৭. দুর্যোগ পরবর্তী সময়ের পরিস্থিতি মোকাবিলায় সমাজের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

স্বেচ্ছাসেবকদের ঐক্যবদ্ধভাবে ত্রাণ বিতরণ

নদীভাঙন মোকাবিলায় প্রস্তুতি

কোথাও নদীভাঙনের আশঙ্কা দেখা দিলে প্রথমেই জীবন ও সম্পদ রক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে। কোথায় আশ্রয় নেওয়া যায় তা আগে থেকেই ঠিক করতে হবে। তাছাড়া সময় থাকতে শিশু, বৃদ্ধ, গর্ভবতী নারী, প্রসূতি ও প্রতিবন্ধীদের নিরাপদ আশ্রয়ে বা আত্মীয়ের বাড়ি পাঠাতে হবে। বাড়ির হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রাখতে হবে। ঘরের মূল্যবান সামগ্রী ও দলিলপত্র আগে থেকে নিরাপদ স্থানে সরাতে হবে। নদীভাঙনের আশঙ্কা

নদীভাঙন

দেখা দিলে প্রয়োজনে বাড়ির গাছপালা, শাকসবজি বিক্রি করে দিতে হবে। আগে থেকেই গোয়ালঘর ও রান্নাঘর নিরাপদ স্থানে সরাতে হবে। ভাঙন কাছাকাছি আসার আগেই থাকার ঘর নিরাপদ স্থানে সরাতে হবে।

নদীভাঙনের পর নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়া

নদীভাঙনের আগেও আমরা কতগুলো পদক্ষেপ নিতে পারি। যা আমাদেরকে নিরাপদ রাখবে। নদীর পাড়ে কোনো কিছু নির্মাণ করতে হলেও তা এমনভাবে করতে হবে যেন সেটা সহজেই সরিয়ে নেওয়া যায়। তাছাড়া নদীর পাড়ে এমন ধরনের গাছ লাগাতে হবে যেগুলোর শিকড় মাটির খুব গভীরে চলে যায়। নদীতে চলাচলকারী বিভিন্ন জলযানের গতিসীমা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যাতে এসব যান নদীতে প্রবল ঢেউ সৃষ্টি না করে। নদীভাঙনের উপক্রম দেখলে আমাদের সব সময় নদীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। নদীভাঙনের পরে আমাদের ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে হবে। তাদের বাড়িঘর নির্মাণে সহায়তা করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধের যেসব স্থানে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো মেরামত করতে হবে।

খরা মোকাবিলায় প্রস্তুতি

খরা

আমাদের দেশের উত্তরাঞ্চলে অনেক সময় খরা হতে দেখা যায়। খরা মোকাবিলায় আমরা কয়েকটি পদক্ষেপ নিতে পারি; যেমন খরার আগে এসব অঞ্চলে পুকুর ও খাল খনন করতে হবে। তাছাড়া যেখানে যেখানে সম্ভব বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে হবে। দুর্যোগকালীন সময়ের জন্য শুকনো খাবার ও নগদ অর্থ মওজুদ রাখতে হবে। একইভাবে গবাদি পশুর জন্যও খাবার মওজুদ করে রাখা প্রয়োজন। এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন করতে হবে। যেসব ফসল চাষে খুব বেশি পানির দরকার হয় না খরাপ্রবণ এলাকায় সেসব ফসল চাষ করতে হবে। খরার ফলে বিপর্যস্ত পরিবারগুলোর জন্য বিকল্প আয়ের উৎস খুঁজতে হবে। এ সময়ে পানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে হবে এবং বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ এড়াতে গবাদি পশুকে পুকুর থেকে দূরে রাখতে হবে। খরা কেটে যাবার পর কৃষিকাজে রাসায়নিক সারের বদলে জৈবসার ব্যবহার করতে হবে। আগাছা ও জঞ্জাল পরিষ্কার

২০২০

করে জমিতে পানির অপচয় কমাতে হবে। এ সময়ে গভীর করে জমি চাষ করতে হবে। মাটির গভীরে শিকড় প্রবেশ করে এমন ফসল চাষ করতে হবে এবং বেশি করে গাছ লাগাতে হবে।

ভূমিকম্প মোকাবিলায় করণীয়

বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চল বেশি ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে আছে। এগুলোকে বলা হয় ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা। যেমন- দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, টাংগাইল, ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার। দেশের অন্যান্য এলাকাগুলোতেও যে ভূমিকম্পের আশঙ্কা নেই তা নয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ভূমিকম্প সম্পর্কে আগে থেকে কোনো পূর্বাভাস পাওয়া যায় না। তারপরও ভূমিকম্প মোকাবিলা অর্থাৎ ভূমিকম্পে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি কমাতে আমরা যেসব পদক্ষেপ নিতে পারি সেগুলো হলো :

ভূমিকম্পের আগে প্রস্তুতি

বাড়িতে প্রধান দরজা ছাড়াও জরুরি অবস্থায় বের হওয়ার জন্য একটি বিশেষ দরজা থাকা প্রয়োজন। এছাড়াও বাড়িতে প্রাথমিক চিকিৎসা সামগ্রী, হেলমেট, টর্চ প্রভৃতি মওজুদ রাখতে হবে। ভূমিকম্পের সময় আশ্রয় নেওয়া যায় বাড়িতে এমন একটি মজবুত টেবিল রাখতে হবে। ঘরের ভারি আসবাবপত্র মেঝের উপরে রাখতে হবে। ব্যবহারের পর বৈদ্যুতিক বাতি ও গ্যাস সংযোগ বন্ধ করে রাখতে হবে। ভূমিকম্প চলাকালীন কোনো শক্ত টেবিল কিংবা শক্ত কাঠের আসবাবপত্রের নিচে অবস্থান নিতে হবে। আতঙ্কিত না হয়ে ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘরের মধ্যে থাকতে হবে। অবিলম্বে সকল বৈদ্যুতিক সুইচ ও গ্যাসের সংযোগ বন্ধ করে দিতে হবে। তবে বাড়ির আশেপাশে যদি যথেষ্ট পরিমাণ খোলা জায়গা থাকে তবে সম্ভব হলে দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে উক্ত খোলা জায়গায় চলে যেতে হবে। ট্রেন, বাস বা গাড়িতে থাকলে চালককে তা থামাতে বলতে হবে। ভূমিকম্পের সময় লিফট ব্যবহার করা যাবে না। ভূমিকম্প হওয়ার পরে আহত লোকজনকে দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সাধ্যমতো উদ্ধার কর্মকাণ্ডে সহায়তা করতে হবে। এ ব্যাপারে ফায়ার ব্রিগেড অর্থাৎ অগ্নিনির্বাপক দল ও অ্যাম্বুলেন্সের সাহায্য নিতে হবে। দুর্গত মানুষের জন্য অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র, খাবার ও পানির ব্যবস্থা করতে হবে।

কাজ-১ : বন্যার সময় কীভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো যেতে পারে বলে তুমি মনে কর?

কাজ-২ : বন্যার পর তোমার এলাকায় দুর্গত মানুষের সাহায্যে তুমি কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পার? একটি তালিকা তৈরি কর।

কাজ-৩ : হঠাৎ ভূমিকম্প অনুভব করলে তুমি আত্মরক্ষার জন্য কী কী করবে?

২০২০

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটার কারণ হলো-

i. ভৌগোলিক অবস্থান

ii. জলবায়ু

iii. ভূমির গঠন ও নদীনালা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২. আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিলাসবহুল দ্রব্যের ব্যবহারের ফলে যা ঘটছে তা হলো-

i. মানবসৃষ্ট এইচ সি এফ সি গ্যাস বৃদ্ধি

ii. বায়ুমণ্ডলে উৎপন্ন হচ্ছে গ্রিনহাউস গ্যাস

iii. আরাম ও সুখে থাকা সহজ হচ্ছে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

করিমগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মধুপুরে বনভোজনে যায়। সেখানে তারা দেখতে পেল কয়েকজন লোক নিয়মভঙ্গ করে বনের ভিতরে কাঠ কাটছে।

৩. উদ্দীপকে প্রত্যক্ষভাবে কোন দুর্যোগটির ইঙ্গিত রয়েছে?

ক. গ্রিনহাউস গ্যাস খ. ওজোন স্তর

গ. বন উজার ঘ. উষ্ণায়ন

৪. উক্ত দুর্যোগটির ফলে-

i. কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়

ii. বৈদ্যুতিক গোলযোগ দেখা দেয়

iii. খাল-বিল শুকিয়ে যায়

২০২০

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i　　খ. ii

গ. i ও ii　　ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ঘটনা-১ : গতকাল রিফাত TV-র সংবাদে জানতে পারল যে, ঢাকার একটি নামকরা শপিংমলের ১১ ও ১২ তলায় সংগঠিত একটি দুর্ঘটনায় বেশ কিছু দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও বহু মানুষ হতাহত হয়। একটি বিশেষ বাহিনীর সদস্যরা এসে উক্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ঘটনা-২ : গত ২৫ শে এপ্রিল ২০১৫ বেলা ১১:৫৬ মিনিটে বাংলাদেশসহ সমগ্র নেপাল একযোগে কেঁপে উঠে। এতে অনেক ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বহুলোক হতাহতের খবরও পাওয়া যায়। আমরা যদি একটু সাবধান হই তাহলে এ ক্ষতির পরিমাণ কমানো যেতে পারে।

ক. বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর ক্ষয়কারী গ্যাসটির নাম কি?

খ. গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া বলতে কী বোঝায়, ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে ঘটনা-১ এর দুর্যোগের কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ঘটনা-২ এর দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনতে তুমি কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পার? মতামত দাও।

২. সাজিদের গ্রামটি ধলেশ্বরী নদীর তীরে অবস্থিত। সকালে খেলার মাঠে গিয়ে দেখল নদী পানিতে পূর্ণ। কিন্তু বিকাল বেলায় গ্রামের লোকজনের ছোটাছুটি, গবাদিপশু ও মালামাল অন্যত্র নিয়ে যাওয়া, ফসল সংরক্ষণের ব্যাপক প্রস্তুতি দেখে সে বুঝল তাদেরও এখন গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে। তার পরিবারের সদস্যরা সাজিদের দাদি ও ৩ বছরের ছোট বোনকে নিয়ে বেশি চিন্তা করছিল।

ক. গ্রিনহাউস গ্যাস কী?

খ. ভূমিধস কেন হয়?

গ. সাজিদের এলাকায় কোন দুর্যোগ দেখা দিয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত দুর্যোগ সাজিদের পরিবারের উপর যে প্রভাব ফেলেছে তা নিরূপণ কর।

নবম অধ্যায়

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও উন্নয়ন

জনসংখ্যা ও উন্নয়ন এই দুটি ধারণা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। একটি দেশের জনসংখ্যার উপর সে দেশের উন্নয়ন অনেকখানি নির্ভর করে। উন্নত দেশের সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশের জনসংখ্যা ও সেসব দেশের জনগণের মাথাপিছু আয়ের তুলনা করলেই আমরা সেটি বুঝতে পারব। উদাহরণ স্বরূপ যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ এই দুটি দেশের কথাই ধরা যাক। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৩৫ জন লোক বাস করে এবং তাদের মাথাপিছু আয় ৫৮০৩০ মার্কিন ডলার (২০১৬)। অন্যদিকে বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১২৫২ জন লোক বাস করে এবং মাথাপিছু আয় মাত্র ১৬১০ (২০১৭ সাল) মার্কিন ডলার। একটি দেশ ভবিষ্যতে কতটা উন্নতি করবে তা দেশটির অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও তার জনসংখ্যানীতির কার্যকর প্রয়োগের উপর নির্ভর করে। বাংলাদেশের মতো একটি জনবহুল এবং উন্নয়নশীল দেশের বেলায় কথাটা আরও বেশি সত্যি। এই অধ্যায়ে আমরা জনসংখ্যা বিষয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন কর্মসূচি এবং জনসংখ্যাকে সম্পদে রূপান্তরের কৌশল সম্পর্কে জানতে পারব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি ও বেসরকারি কর্মসূচি বর্ণনা করতে পারব;
- জনসংখ্যার সাথে জনসম্পদের সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারব;
- জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের কৌশল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- জনসংখ্যা তথ্যের উপস্থাপনে সংখ্যাতাত্ত্বিক কৌশল প্রয়োগ করতে পারব;
- বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিষয়ক সমস্যার ক্ষেত্রে সচেতন হব।

পাঠ-১ : বাংলাদেশের জনসংখ্যানীতি

সাধারণভাবে একটি দেশের জনসংখ্যা বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য যে দিক নির্দেশনা হয় তাকেই বলা হয় দেশটির জনসংখ্যা নীতি। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই নীতি প্রণয়ন করা হয়। এ নীতির লক্ষ্য হলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে দেশের নাগরিকদের জীবনমানের উন্নতি এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। বাংলাদেশের জনসংখ্যানীতির মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যগুলো হলো :

১। দেশের সব মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা পৌঁছে দেওয়া। বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য পরিবার পরিকল্পনার সুযোগ ও অত্যাবশ্যক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

২। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা জোরদার করা।

২০২০

৩। শিশু ও নারীর অপুষ্টির হার কমিয়ে আনা।

৪। ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা। থানা ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সার্বক্ষণিক ডাক্তার, নার্স ও প্রয়োজনীয় ঔষধের সরবরাহ নিশ্চিত করা। প্রতিটি গ্রামে প্রসূতিদের নিরাপদ সন্তান জন্মদানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৫। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে সর্বত্র ও সকলের কাছে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেওয়া।

৬। দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা।

৭। দেশের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

জনসংখ্যা সম্পর্কে বর্তমানে বাংলাদেশের স্লোগান হচ্ছে 'দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভালো হয়।' প্রতিবছর ২রা ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে 'জাতীয় জনসংখ্যা দিবস' পালন করা হয়।

কাজ- ১ : আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জনসংখ্যানীতির ভূমিকা আলোচনা কর।

পাঠ-২ : জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ

সরকারি উদ্যোগ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার কমিয়ে আনার জন্য সরকার নিম্নলিখিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে :

ক. নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সাক্ষরতার হার বাড়ানোর জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সরকার ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর ও ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ইতোমধ্যে এই কর্মসূচি শতভাগ অর্জিত না হলেও প্রায় অর্জনের পথে।

খ. সরকার নারীশিক্ষার প্রসারের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যেমন প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ এবং ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

গ. সরকার নাগরিকদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। একই সঙ্গে পরিবার ছোট রাখার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম চালু রয়েছে।

ঘ. কাজি অফিসে বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

ঙ. হাঁস-মুরগির খামার ও মাছ চাষের মতো আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণের উপর সরকার গুরুত্ব আরোপ করেছে। তাছাড়া পোশাকশিল্প, কারুশিল্প এবং অন্যান্য হস্ত ও কুটিরশিল্পেও নারীরা বর্তমানে বেশি সংখ্যায় অংশ নিচ্ছে। এগুলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। শিশুমৃত্যু হ্রাসের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করায় বাংলাদেশ ২০১০ সালে জাতিসংঘ পুরস্কার লাভ করেছে। এছাড়া নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নারীদের শিক্ষকতাসহ নানা চাকরির ক্ষেত্রে কোটা প্রথা চালু রয়েছে।

কাজ- ১ : জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কোন পদক্ষেপটি তোমার এলাকার জন্য বেশি কার্যকর বলে তুমি মনে কর? ব্যাখ্যা কর।

২০২০

বেসরকারি উদ্যোগ

স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো (NGO) বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মুক্তিযুদ্ধের পরে বাংলাদেশের মানুষকে পুনর্বাসনে সহায়তার মাধ্যমে তারা তাদের কাজ শুরু করে। বর্তমানে এই সংস্থাগুলোর কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হচ্ছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে কর্মরত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কার্যক্রম নিচে তুলে ধরা হলো :

ক. **কমিউনিটিভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প :** এই প্রকল্পের আওতায় গ্রাম ও শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পরিবার ছোট রাখার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে তাদের উৎসাহ দেওয়া হয়। প্রকল্পের আওতায় মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, টিকা, ইনজেকশন ও পুষ্টি শিক্ষা বিষয়েও সেবা প্রদান করা হয়।

খ. **দুই সন্তানের পরিকল্পিত পরিবার গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়ন :** বাংলাদেশ সরকার দুটি সন্তানের পরিবার গড়ার জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। বেসরকারি সংস্থাগুলো এই লক্ষ্য অর্জনে কাজ করছে। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যও তারা কাজ করছে।

গ. **বাল্যবিবাহ রোধে উদ্বুদ্ধকরণ :** দেশে বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ঘ. **প্রশিক্ষণ কার্যক্রম :** বেসরকারি সংস্থাগুলোর বিশেষজ্ঞরা মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবা, টিকা দান ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে জনগণকে প্রশিক্ষিত করছে।

ঙ. **সচেতনতা কার্যক্রম :** জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবিলায় বেসরকারি সংস্থাগুলো জনগণকে সচেতন করার জন্য নানা রকম উপকরণ তৈরি ও ব্যবহার করে। যেমন: পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সাময়িকী, পোস্টার, ক্যালেন্ডার, চার্ট, নিউজলেটার, ডকুমেন্টারি ফিল্ম ইত্যাদি।

চ. **ধর্মীয় নেতাদের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি :** বেসরকারি সংস্থাগুলো স্থানীয় ধর্মীয় নেতাদের জন্য কর্মশালা আয়োজন করে তাঁদের এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে। ধর্মীয় নেতারাও জনসংখ্যা হ্রাসের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেন।

কাজ : জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২০২০

পাঠ-৩ : জনসংখ্যার সাথে জনসম্পদের সম্পর্ক

জমির পরিমাণ হিসাব করলে মাথাপিছু জমির অনুপাতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা এমনিতেই খুব বেশি। উপরন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও এখানে বেশি। যদিও আগের তুলনায় বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিছুটা কমে এসেছে। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম এবং মানুষের ক্রমবর্ধমান সচেতনতার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির ফলে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার ইদানীং কমে এসেছে। এর ফলেও দেশে জনসংখ্যা বাড়ছে। দেশের অশিক্ষিত ও কর্মহীন জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে তরুণদের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে জনসংখ্যাকে অনায়াসে জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব। এভাবে দেশ দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে।

কাজ : কীভাবে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা যায়?

পাঠ-৪ : জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের কৌশল

সম্পদ যেখানে সীমিত সেখানে একটি দেশের বিশাল জনসংখ্যা তার জন্য বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তবে উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়ে জনসংখ্যাকে জনসম্পদেও পরিণত করা যায়। বিশ্বের অনেক দেশ ইতোমধ্যে তাদের বিশাল জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করেছে। এ ব্যাপারে আমরা চীনের উদাহরণ দিতে পারি। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত ও শ্রীলঙ্কা জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার ক্ষেত্রে সাফল্য দেখিয়েছে। বিশেষ করে তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভারত আজ বেশ এগিয়ে। এমন কি যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত দেশেরও তথ্য-প্রযুক্তিখাত ২৩ ভাগ ভারতীয় দক্ষ জনশক্তির উপর নির্ভরশীল। আমাদের দেশও বিগত বছরগুলোতে তথ্য-প্রযুক্তিখাতে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে। সরকার এদেশের যুবশক্তিকে সম্পদে রূপান্তরের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আগামী দিনে যার সুফল পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। আমাদের দেশে জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করার জন্য নেওয়া কৌশলগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো:

- কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা;
- দক্ষতাবৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
- প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার;
- নারীশিক্ষার প্রসার;
- স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমের প্রসার;
- উৎপাদনমুখী খাতের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ;
- কৃষিভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সম্প্রসারণ;
- কর্মসংস্থানের জন্য কৃষির আধুনিকীকরণ;

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার প্রদান ;
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিস্তার ;
- সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রচুর বৃত্তির ব্যবস্থা করে অধিক সংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা ও উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিশ্বের উন্নত ও প্রযুক্তি-নির্ভর দেশগুলোতে প্রেরণ।

কাজ-১: জনসংখ্যা কখন জনসম্পদে পরিণত হয়?

কাজ-২ : জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করার উপায়গুলো আলোচনা কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. প্রতি বছর কোন তারিখে বাংলাদেশে জাতীয় জনসংখ্যা দিবস উদযাপন করা হয় ?

ক. ২রা ফেব্রুয়ারি খ. ৮ই মার্চ

গ. ২১শে ফেব্রুয়ারি ঘ. ১লা মে

২. বাংলাদেশে জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করার উপায় হচ্ছে–

i. শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ

ii. কৃষি, শিল্প এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অগ্রাধিকার

iii. দক্ষ জনশক্তিকে বিদেশে রপ্তানি করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

ক্রমিক নং	দেশ	প্রতি বর্গ কি.মি. জনসংখ্যা	মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলারে)
১	যুক্তরাষ্ট্র	৩৫	৫৮০৩০
২	ভারত	৪৪৫	১৭০৯
৩	বাংলাদেশ	১২৫২	১৬১০

ক. ২০১০ সালে বাংলাদেশ কোন ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য জাতিসংঘ পুরস্কার লাভ করেছে ?

খ. জনসংখ্যানীতি বলতে কী বোঝায় ?

গ. উপরের তালিকা অনুসারে বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে বাধা কোনটি? বর্ণনা কর।

ঘ. ছকে বর্ণিত ২ নং দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে কীভাবে বাংলাদেশ জনসম্পদে সমৃদ্ধ হতে পারবে বলে তুমি মনে কর, মতামত দাও।

২০২০

দশম অধ্যায়

বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা

সামাজিক সমস্যা হলো সমাজে বিরাজিত একটি অবস্থা, যা জনগণের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে এবং এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য কিছু সংখ্যক ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালায়। বাংলাদেশে নানা সামাজিক সমস্যা রয়েছে। তার মধ্যে কিশোর অপরাধ ও মাদকাসক্তি দুটি বড় সমস্যা। বর্তমানে এ দুটি সমস্যা সবার জন্যই উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- কিশোর অপরাধের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- কিশোর অপরাধের কারণ ও প্রভাব বর্ণনা করতে পারব;
- কিশোর অপরাধ প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- মাদকাসক্তির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মাদকাসক্তির কারণ ও প্রভাব বর্ণনা করতে পারব;
- মাদকাসক্তি প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- সমাজ জীবনে কিশোর অপরাধ ও মাদকাসক্তির প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হব এবং এসব সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজব এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ আচরণে উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ-১ : কিশোর অপরাধের ধারণা ও কারণ

অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে বা কিশোরদের দ্বারা সংগঠিত বিভিন্ন ধরনের অপরাধকেই বলা হয় কিশোর অপরাধ। কোন বয়স পর্যন্ত অপরাধীকে কিশোর অপরাধী বলা হবে তা নিয়ে অবশ্য বিভিন্ন দেশের সমাজবিজ্ঞানী ও আইনবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলঙ্কায় ৭ থেকে ১৬ বছর বয়সী কিশোরদের অপরাধমূলক কাজকে কিশোর অপরাধ বলা হয়। অন্যদিকে পাকিস্তান ও থাইল্যান্ডে কিশোর অপরাধীর বয়সসীমা ৭ থেকে ১৮ বছর। আর জাপানে এ বয়সসীমা ১৪ থেকে ২০ বছর। কিশোর বয়সে এরা রাষ্ট্র ও সমাজের আইন ও নিয়ম ভাঙে বলেই তারা কিশোর অপরাধী।

কিশোর অপরাধীরা সাধারণত যে সব অপরাধ করে থাকে, সেগুলো হচ্ছে চুরি, খুন, জুয়া খেলা, স্কুল পালানো, বাড়ি থেকে পালানো, পরীক্ষায় নকল করা, বিদ্যালয় ও পথেঘাটে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, পকেটমারা, মারপিট করা, বোমাবাজি, গাড়ি ভাংচুর, বিনা টিকিটে ভ্রমণ, পথেঘাটে মেয়েদের উত্যক্ত করা, এসিড নিক্ষেপ, নারী নির্যাতন, অশোভন ছবি দেখা, মাদক গ্রহণ ইত্যাদি। আমাদের দেশের কিশোর অপরাধীরাও সাধারণত এ ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকে।

শিশু-কিশোররা নানা কারণে অপরাধী হয়ে উঠে। আমাদের দেশে কিশোর অপরাধের অন্যতম প্রধান কারণ দারিদ্র্য। দরিদ্র পরিবারের কিশোরদের অনেক সাধ বা ইচ্ছাই অপূর্ণ থেকে যায়। এর ফলে তাদের মধ্যে বাড়ে হতাশা এবং এ হতাশাই তাদের অপরাধের দিকে ঠেলে দেয়। সুস্থ পারিবারিক জীবন ও সুষ্ঠু সামাজিক পরিবেশের অভাবেও শিশু-কিশোররা অপরাধী হয়ে উঠতে পারে। বাড়ির বাইরে বা কর্মস্থলে অতি ব্যস্ততার কারণে মাতাপিতার পক্ষে তাঁদের সন্তানদের যথেষ্ট সময় বা মনোযোগ দিতে না পারা, আদর-যত্নের অভাব, মাতাপিতার অকাল মৃত্যু বা বিবাহবিচ্ছেদ, এমনকি অভিভাবকদের অতিরিক্ত শাসনের কারণেও অনেক কিশোর ধীরে ধীরে অপরাধী হয়ে উঠে। মাতাপিতার মধ্যকার জটিল দাম্পত্য সম্পর্ক ও তাঁদের খারাপ আচরণও অনেক সময় কিশোর-কিশোরীদের অপরাধ প্রবণ করে তোলে। সংসারত্যাগী, অপরাধী, দুশ্চরিত্র এবং অযোগ্য ও উদাসীন মাতাপিতার সন্তানরাও পরিবারে অসংযত আচরণ করে এবং পরে অপরাধী হিসাবে বেড়ে উঠে।

চিত্তবিনোদনের অভাবের কারণেও অনেক কিশোর-কিশোরী অপরাধী হয়ে উঠে। ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলা, সংগীত, ছবি আঁকা, শরীর চর্চা ও বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কার্যাবলির সঙ্গে জড়িত শিশু-কিশোররা সাধারণত আনন্দময় পরিবেশে সুস্থভাবে বেড়ে উঠে। অন্যদিকে যারা এসবের সুযোগ পায় না তারা মানসিক অস্থিরতা থেকে মুক্তির অন্য পথ খোঁজে। তারাই পরে নানা রকম অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।

শহরের বিভিন্ন এলাকায় ও শিল্পাঞ্চলে বস্তি রয়েছে। বস্তির পরিবেশ ও সেখানকার নানা খারাপ অভিজ্ঞতা শিশু-কিশোরদের অপরাধী করে তোলে। সঙ্গদোষে এবং অভাবের তাড়নায়ও বস্তির শিশু-কিশোররা অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। দরিদ্র পরিবারের শিশু-কিশোররা অল্পবয়সেই নানা রকম কাজ করে টাকা উপার্জন করতে বাধ্য হয়। অর্থ উপার্জন করতে গিয়ে বা লোভে পড়েও তারা অনেক সময় অপরাধের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

শারীরিক-মানসিক ত্রুটি বা বৈকল্য শিশুমনে হীনমন্যতার জন্ম দেয়। এর ফলেও অনেকে অপরাধী হতে পারে। আবার বেশি রকম আবেগপ্রবণ বা প্রতিভাবান শিশু-কিশোররাও অনেক সময় অপরাধী হয়ে উঠে। কারণ এ ধরনের শিশু-কিশোরদের মানসিক গঠন সাধারণের চেয়ে জটিল হয়। তারাও তাদের প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে অপরাধী হয়ে উঠতে পারে।

যেসব মাতাপিতা বারবার কর্মস্থল পরিবর্তন করেন তাঁদের সন্তানরা নতুন নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। সঙ্গী বা বন্ধু নির্বাচনে তাদের সমস্যা হয়। এভাবে সঙ্গদোষেও কেউ কেউ অপরাধী হতে পারে। বর্তমানে মোবাইল ও ইন্টারনেটের অপব্যবহারের ফলেও সমাজে এক ধরনের কিশোর অপরাধ দেখা যাচ্ছে।

কাজ : কী কী কারণ শিশু-কিশোরদের অপরাধী করে তোলে? উল্লেখ কর।

পাঠ-২ : কিশোর অপরাধের প্রভাব ও প্রতিরোধ

বাংলাদেশে কিশোররা সাধারণত যেসব অপরাধ করে তার মধ্যে রয়েছে চুরি, পকেটমার, বিনা টিকিটে রেলভ্রমণ; মানুষ, দোকানপাট, বাড়িঘর ও যানবাহনের উপর হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও অন্যান্য নাশকতামূলক কাজ এবং মেয়েদের উত্যক্ত করা প্রভৃতি। এছাড়াও কিশোর অপরাধীরা অনেক সময় দলবেঁধে ডাকাতি এবং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করে থাকে। কখনো কখনো তারা খুন পর্যন্ত করে। যে পরিবারে এ রকম কিশোর অপরাধী আছে তাদের পারিবারিক শান্তি বিনষ্ট হয়। কখনো কখনো বাংলাদেশের শহর ও গ্রামাঞ্চল সর্বত্রই কিশোর অপরাধীদের দ্বারা মেয়েদের উত্যক্ত করার ঘটনা শোনা যায়। তারা মেয়েদের প্রতি অশ্লীল ও অশোভন উক্তি করে। এদের কারণে মেয়েরা নিরাপদে স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় যাতায়াত করতে পারে না। বখাটে কিশোরদের অন্যায় প্রস্তাবে সাড়া না দিলে তারা মেয়েদের অপহরণ, শারীরিক নির্যাতন বা তাদের উপর এসিড নিক্ষেপ করে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে অনেক সময় অভিভাবকরাও তাদের আক্রমণের শিকার হয়। এসব বখাটের উৎপাতে কখনো কখনো ছাত্রীদের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। কিশোর অপরাধীরা অনেক সময় মাদকাসক্তি ও অন্যান্য খারাপ অভ্যাসের সঙ্গে জড়িত থাকে।

প্রতিরোধের উপায়

বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ প্রবণতা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এ সমস্যার প্রতিরোধে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন :

অভিভাবক সচেতনতা ও দায়িত্ব

কিশোরদের অপরাধ প্রবণতার ধরন, তার কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে মাতাপিতা ও পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠরা যদি সচেতন থাকেন তবে তাঁরা সহজেই কিশোরদের অপরাধ থেকে দূরে রাখতে বা সে পথ থেকে সরিয়ে আনতে পারবেন। এজন্য পরিবারে সন্তানদের সুস্থ মানসিক বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। তাদের চলাফেরার উপর নজর রাখতে হবে। তাদের বন্ধু ও সাথিদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখতে হবে। সন্তানদের সঙ্গে সহজ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি

কিশোরদের অপরাধ প্রবণতার একটি প্রধান কারণ পরিবারের দারিদ্র্য। সেজন্য অভিভাবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে। এ ব্যাপারে সরকার এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাকে এগিয়ে আসতে হবে।

শিক্ষার সুযোগ

সকল শিশু-কিশোরকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় আনতে হবে। এতে তারা একদিকে শিক্ষার প্রভাবে সুস্থ ও সুন্দর জীবন-যাপনে আগ্রহী হবে। অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ তাদেরকে অপরাধ থেকে দূরে রাখবে।

চিত্তবিনোদন

শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশের জন্য পাড়া ও মহল্লায় পাঠাগার, ব্যায়ামাগার প্রভৃতি স্থাপন করা প্রয়োজন। এছাড়া বিদ্যালয়, মাদরাসা ও আবাসিক এলাকায় খেলার মাঠ থাকতে হবে।

উল্লিখিত কার্যক্রম ছাড়াও শিশু-কিশোরদের সব রকম খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখতে হবে। এজন্য টেলিভিশনে ও অন্যান্য মাধ্যমে তাদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্যমূলক এবং সুস্থ আনন্দদায়ক দেশি ও বিদেশি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। অশোভন ছবি প্রদর্শন এবং প্রকাশনা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিতে হবে। শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করতে হবে। শিশু-কিশোররা যেন খারাপ সংস্পর্শে না পড়ে সে ব্যাপারে তাদের নিজেদের যেমন সতর্ক থাকতে হবে, তেমনি অভিভাবকদেরও এ ব্যাপারে সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

কাজ : কিশোর অপরাধ রোধে কী কী কাজ করা যেতে পারে? আলোচনা কর।

পাঠ-৩: মাদকাসক্তির ধারণা ও কারণ

মাদকাসক্ত-সঙ্গীদের সাথে মেলামেশার মধ্য দিয়েই প্রধানত মাদকাসক্তির সূত্রপাত ঘটে। মাদকের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে না জেনেই, কেবল সাময়িক উত্তেজনা লাভের জন্য ও বন্ধুদের প্ররোচনায় কিশোর-কিশোরীরা মাদকদ্রব্য সেবন করে। পরে তা তাদের মরণনেশায় পরিণত হয়। কিশোরমন স্বভাবতই কৌতূহলপ্রবণ। ফলে শুধুমাত্র কৌতূহলের বশেও অনেকে মাদক গ্রহণ করা শুরু করে। পিতা বা বাড়ির অন্য বয়স্কদের পকেট থেকে বিড়ি-সিগারেট চুরি করে শিশু-কিশোররা অনেক সময় তাদের কৌতূহল মিটায়। এই কৌতূহল থেকে একসময় তাদের ধূমপানের অভ্যাস গড়ে উঠে। এই ধূমপান থেকেই তারা পরে অন্যান্য নেশাদ্রব্য যেমন-গাঁজা, ফেনসিডিল, হেরোইন, ইয়াবা প্রভৃতিতে আসক্ত হয়ে পড়ে। বেকারত্ব, নিঃসঙ্গতা, প্রিয়জনের মৃত্যু, প্রেমে ব্যর্থতা, পারিবারিক অশান্তি ইত্যাদি কারণে অনেকের মনে হতাশার সৃষ্টি হয়। আর এই হতাশা থেকে মুক্তি লাভের আশায় প্রথমে বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে বা তাদের দেখাদেখি অনেকে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করতে শুরু করে। পরে এটা তাদের নেশায় পরিণত হয়। মাতাপিতার স্নেহ ও মনোযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে কিংবা পারিবারিক অশান্তি ও ঝগড়াবিবাদ থেকেও অনেক সময় শিশু-কিশোরদের মনে হতাশা জন্ম নেয়। এক পর্যায়ে তারা মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ে।

অপসংস্কৃতির প্রভাবও মাদকাসক্তির পিছনে একটি বড় কারণ হিসাবে কাজ করে। চলচ্চিত্র, টিভি চ্যানেল, ইন্টারনেট প্রভৃতির মাধ্যমে আজকাল এক দেশের সংস্কৃতি সহজেই অন্য দেশের সংস্কৃতি ও জনজীবনকে প্রভাবিত করছে। দুই ভিন্ন সংস্কৃতির টানাপোড়নে পড়েও যুব সমাজের একটা অংশ বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মাদকে আকৃষ্ট হচ্ছে।

কাজ : শিশু-কিশোরদের মাদকাসক্ত হওয়ার পিছনে কী কী কারণ কাজ করে? আলোচনা কর।

পাঠ-৪ : মাদকাসক্তির প্রভাব ও প্রতিরোধ

আমাদের সমাজজীবনে মাদকাসক্তি বর্তমানে একটি ভয়াবহ সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। এটি আমাদের সামাজিক ও নৈতিক জীবনেও মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। শারীরিক ক্ষতির মধ্যে একজন মাদক গ্রহণকারীর হৃদরোগ, যক্ষা, ক্যান্সার ও শ্বাসকষ্ট হতে পারে। তার মানসিক স্বাস্থ্যও এর ফলে দুর্বল হয়ে পড়ে। মাদক গ্রহণকারীরা হতাশা ও হীনমন্যতায় ভোগে। নিজেদের ক্ষতি তো এরা করেই, উপরন্তু ভয়, উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনার শিকার হয়ে সমাজেও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে।

পারিবারিক জীবনে মাদকের প্রভাব নানা জটিল সমস্যা সৃষ্টি করে। পুরো পরিবারের সুখ-শান্তিকে নষ্ট করে। যে পরিবারে একজনও মাদকাসক্ত সন্তান থাকে সে পরিবারে ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকে। প্রতিবেশীদের কাছে ঐ পরিবারের মর্যাদা থাকে না। মাদকের টাকার যোগান দিতে গিয়ে অনেক সময় পরিবারটি একেবারে নিঃস্ব হয়ে যায়। তাছাড়া হত্যা, আত্মহত্যা, বাড়ি থেকে পালানো বা নিরুদ্দেশ হওয়ার মতো ঘটনাও ঘটে। যে দেশে সহজেই মাদক পাওয়া যায় সেখানে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি ও হত্যার ঘটনাও বেশি ঘটে। মাদকের প্রভাবে সামাজিক অস্থিরতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দেয়। মাদকের হাত থেকে সমাজের মানুষকে রক্ষা করার জন্য তাই মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও মাদক নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এ জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে :

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

মাদকাসক্তি রোধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাই সবচেয়ে ভালো ও কার্যকর। এ জন্য সমাজে নৈতিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে। সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ শেখানোর জন্য অভিভাবক ও পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের সচেষ্ট হতে হবে। মোটকথা ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে ও অন্যান্য উপায়ে মাদক বিরোধী সচেতনতা ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

স্থানীয় পর্যায়ে মসজিদ এবং মন্দিরসহ সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ক্লাব-সমিতি প্রভৃতি সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংস্থাগুলো নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে মাদকাসক্তি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'মাদককে না বলুন'-এই প্রতিজ্ঞায় জনগণ বিশেষ করে তরুণদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এছাড়া সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, পোস্টার, বিলবোর্ড ও লিফলেট ইত্যাদির মাধ্যমেও মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে।

সুস্থ চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করে শিশু-কিশোরদের সেদিকে আকর্ষণ করতে হবে যাতে তারা মাদক গ্রহণ ও অন্যান্য খারাপ অভ্যাসের দিকে ঝুঁকে না পড়ে। একই সঙ্গে অশোভন চলচ্চিত্র প্রচার বন্ধ করা দরকার। এছাড়াও মাদকাসক্তি প্রতিরোধে বিদ্যমান আইনি পদক্ষেপগুলো গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

২০২৫

মাদকাসক্তি নিয়ন্ত্রণে আইনসমূহ:

বাংলাদেশে বর্তমানে মাদকাসক্তি একটি ভয়াবহ জটিল সমস্যা। বাংলাদেশ সরকার মাদকাসক্তি প্রতিরোধে জাতিসংঘের মাদক নিয়ন্ত্রণের ০৩টি কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০ সালে মাদক বিরোধী সার্ক কনভেনশনেও স্বাক্ষর করেছে।

বাংলাদেশ সরকার তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) সম্পর্কে সর্বশেষ বিধিমালা ২০১৩, প্রণয়ন করে তামাকজাত দ্রব্য পাবলিক প্লেসে এবং পাবলিক পরিবহনে ব্যবহার করলে এর শাস্তির বিধান রেখেছে। বিধিতে বলা হয়েছে, অফিস আদালত, গ্রন্থাগার, লিফট, আচ্ছাদিত কর্মক্ষেত্র, হাসপাতাল ও ক্লিনিক, বিমান বন্দর, নৌবন্দর, সমুদ্রবন্দর, রেলওয়ে স্টেশন, বাস টার্মিনাল, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী ক্ষেত্র, থিয়েটার হল, বিপনী বিতান, আবদ্ধ রেস্তোরা, পাবলিক টয়লেট, শিশু পার্ক, মেলা, পাবলিক পরিবহনের জন্য অপেক্ষার স্থান এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সরকার ঘোষিত স্থান সমূহে ধূমপান দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। কোনো ব্যক্তি পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান করতে পারবেন না। শাস্তির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, 'এই বিধান কেউ লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক ৩ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয় বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডনীয় হইবেন।'

ধূমপান ও অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্যের উৎপাদন ও বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ করতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে নেশা বা মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচার চালাতে হবে। মাদক উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। ছাত্রদের সামনে শিক্ষকের ধূমপানকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করতে হবে। ঔষধ হিসাবে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত মাদকজাতীয় দ্রব্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

কাজ : আমাদের সমাজে মাদকাসক্তি রোধে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়? আলোচনা কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আমাদের দেশে কিশোর অপরাধের প্রধান কারণ কী?

ক. দারিদ্র্য খ. আদর-যত্নের অভাব

গ. বিবাহবিচ্ছেদ ঘ. চিত্তবিনোদনের অভাব

২. মাদকাসক্তি প্রতিরোধে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা হচ্ছে-

i. ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব দেওয়া

ii. নৈতিক মূল্যবোধ শেখানো

iii. মাদকজাতীয় দ্রব্যের উৎপাদন নিষিদ্ধ করা

২০২০

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   খ. i ও iii

গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

তারিক মাতা-পিতার আদরের সন্তান। ইদানীং তার আচরণে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। স্কুলে না গিয়ে সে লুকিয়ে লুকিয়ে ধূমপান করে এবং টাকার জন্য মাকে প্রায়ই বিরক্ত করে।

৩. **তারিকের আচরণটিতে কী প্রকাশ পায়?**

ক. শিশু অপরাধ   খ. মূল্যবোধের অবক্ষয়

গ. মাদকাসক্তি   ঘ. নিঃসঙ্গতা

৪. **উদ্দীপকে বর্ণিত তারিকের আচরণের ফলে-**

i. বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা দেখা দিবে

ii. মানসিক স্বাস্থ্যের তেমন পরিবর্তন হবে না

iii. সামাজিক জীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   খ. i ও iii

গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জনাব সাঈদ লক্ষ করলেন কয়েক মাস যাবত তার মেয়ে বিদ্যালয়ে একা যেতে সংকোচবোধ করছে। কারণ তার এলাকার ১৫-১৬ বৎসর বয়সী কয়েকজন ছেলে বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে মেয়েদেরকে নানাভাবে উত্যক্ত করে। বিষয়টি তাকে চিন্তিত করে তোলে। তিনি এ সমস্যা সমাধানের জন্য অভিভাবকদের সাথে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

ক. মাদকাসক্তি রোধে কোন প্রতিজ্ঞায় তরুণদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে?

খ. অপসংস্কৃতির প্রভাব মাদকাসক্তির বড় কারণ– বুঝিয়ে লেখ।

গ. কোন ধরনের সামাজিক সমস্যার কারণে জনাব সাঈদ চিন্তিত–ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জনাব সাঈদের গৃহীত উদ্যোগের কার্যকারিতা মূল্যায়ন কর।

একাদশ অধ্যায়

বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী

বাংলাদেশে বৃহত্তর নৃগোষ্ঠী বাঙালিদের পাশাপাশি আরও বেশ কিছু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করে আসছে। এ অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী যেমন : চাকমা, গারো, সাঁওতাল, মারমা ও রাখাইনদের ভৌগোলিক অবস্থান, জীবনধারা, সামাজিক রীতিনীতি ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- বাংলাদেশের চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, রাখাইন নৃগোষ্ঠীর ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে জানব এবং মানচিত্রে শনাক্ত করতে পারব;
- বাংলাদেশের চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, রাখাইন নৃগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, রাখাইন নৃগোষ্ঠীর সাথে বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, রাখাইন নৃগোষ্ঠী ও বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান প্রদান ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, রাখাইন নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করব।

পাঠ-১ : বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভৌগোলিক অবস্থান

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রধান একটি অংশ বাস করে এ দেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে : রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায়। এসব জেলায় বসবাসকারী নৃগোষ্ঠীগুলো হলো-চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, পাংখুয়া, চাক, খ্যাং, খুমি এবং লুসাই। নৃতাত্ত্বিক বিচারে এরা মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর মানুষ।

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাংশেও মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর বাস রয়েছে। এদের মধ্যে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের গারো, হাজং, কোচ এবং বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে খাসি ও মণিপুরি প্রভৃতি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও কক্সবাজার, পটুয়াখালি ও বরগুনা জেলায় বাস করে মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীভূক্ত রাখাইনরা।

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশের দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা প্রভৃতি এলাকায় এবং উত্তর-পূর্বাংশের বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলেও নানা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোক বসবাস করে। এদের মধ্যে রয়েছে সাঁওতাল, ওরাঁও, মাহালি, মুন্ডা, মাল পাহাড়ি, মালো প্রভৃতি।

২০২০

বাংলাদেশে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো- ডালু, হদি, পাত্র, রাজবংশী, বর্মণ, বানাই, পাহান, মাহাতো, কোল প্রভৃতি।

কাজ-১: বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নাম, আবাসস্থল ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় উল্লেখ কর।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নাম	আবাসস্থল	নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

কাজ-২: বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে প্রধান প্রধান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভৌগোলিক অবস্থান শনাক্ত কর।

পাঠ-২ : চাকমা

বাংলাদেশের রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় বসবাসকারী প্রধান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হলো চাকমা। নৃতাত্ত্বিক বিচারে চাকমারা মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর লোক। তাদের মুখমণ্ডল গোলাকার, নাক চ্যাপ্টা, চুল সোজা এবং কালো, গায়ের রং ঈষৎ হলদেটে। বাংলাদেশের বাইরেও চাকমারা ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম ও অরুণাচলে বসবাস করে।

সামাজিক জীবন : চাকমা সমাজে মূল অংশ পরিবার। কয়েকটি চাকমা পরিবার নিয়ে গঠিত হয় 'আদাম' বা 'পাড়া'। পাড়ার প্রধানকে বলা হয় কার্বারি। কয়েকটি পাড়া নিয়ে গঠিত হয় মৌজা। মৌজার প্রধানকে বলা হয় হেডম্যান। কার্বারি ও হেডম্যান মিলে যথাক্রমে পাড়া ও মৌজার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করে। কয়েকটি মৌজা মিলে চাকমা সার্কেল গঠিত হয় এবং এর প্রধান হলেন চাকমা রাজা। চাকমা সমাজে রাজার পদটি বংশানুক্রমিক। চাকমা সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। চাকমা পরিবারে পিতাই প্রধান। তারপরে মা ও জ্যেষ্ঠপুত্রের স্থান।

অর্থনৈতিক জীবন : চাকমাদের জীবিকার প্রধান উপায় হচ্ছে কৃষিকাজ। যে পদ্ধতিতে তারা চাষ করে তাকে বলা হয় 'জুম'। তবে বর্তমান সময়ে তারা হালচাষেও অভ্যস্ত হয়েছে।

ধর্মীয় জীবন : চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাদের অধিকাংশ গ্রামে 'কিয়াং' বা বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে। চাকমারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় দিনকে ভক্তি সহকারে পালন করে। এর মধ্যে গৌতম বুদ্ধের জন্ম, মৃত্যু ও বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির দিনটি তারা সাড়ম্বরে 'বৈশাখী পূর্ণিমা' হিসাবে পালন করে। তাছাড়া 'মাঘী পূর্ণিমার' রাতে কিয়াং বা প্যাগোডার প্রাঙ্গণে গৌতম বুদ্ধের সম্মানে ফানুস উড়ায়। চাকমা সমাজে মৃতদেহ দাহ করা অর্থাৎ পোড়ানো হয়।

সাংস্কৃতিক জীবন

চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক

চাকমারা নিজেদের তাঁত দিয়ে পোশাক তৈরি করে। চাকমা মেয়েদের পরনের কাপড়ের নাম 'পিনোন' এবং 'হাদি'। পূর্বে চাকমা পুরুষেরা এক রকম মোটা সুতার জামা, ধুতি ও গামছা পরত এবং মাথায় এক রকম পাগড়ি বাঁধতো। ইদানীং তারা শার্ট, প্যান্ট ও লুঙ্গি পরিধান করে। চাকমা মহিলাদের তৈরি বিভিন্ন কাপড়ের মধ্যে 'ফুলগাদি' ও নানা ধরনের ওড়না দেশি ও বিদেশি সবার কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। চাকমারা বাঁশ ও বেত দিয়ে সুন্দর সুন্দর ঝুড়ি, পাখা, চিরুনি, বাঁশি এবং বাদ্যযন্ত্র তৈরি করে।

চাকমাদের প্রধান খাদ্য ভাত। তারা ভাতের সাথে মাছ, মাংস এবং শাকসবজি খেতে ভালোবাসে। তাদের প্রিয় খাদ্য বাঁশ কোড়ল। বাঁশ কোড়ল দিয়ে চাকমা মেয়েরা বেশ কয়েক ধরনের রান্না করে। চাকমারা হা-ডু-ডু, কুস্তি এবং 'ঘিলাখারা' খেলতে ভালোবাসে। ছোট ছোট মেয়েরা 'বউচি' খেলে।

চাকমাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সর্ববৃহৎ উৎসব হলো 'বিজু'। বাংলা বর্ষের শেষ দুদিন ও নববর্ষের প্রথম দিনে চাকমারা বিজু উৎসব পালন করে। অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর তুলনায় চাকমারা তুলনামূলকভাবে বেশি শিক্ষিত।

কাজ : চাকমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।

জীবনব্যবস্থা	বৈশিষ্ট্য
সামাজিক	
অর্থনৈতিক	
সাংস্কৃতিক	
ধর্মীয়	

পাঠ- ৩ : গারো

বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে গারোরা হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ। গারোরা ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইলের মধুপুর, নেত্রকোনা, শেরপুর, জামালপুর ও গাজীপুরের শ্রীপুরে বাস করে। বৃহত্তর সিলেট জেলায়ও কিছু সংখ্যক গারো রয়েছে। বাংলাদেশের বাইরে ভারতের মেঘালয় ও অন্যান্য রাজ্যেও গারোরা বাস করে। বাংলাদেশের গারোরা সাধারণত সমতলের বাসিন্দা।

এই নৃগোষ্ঠীর আদি বাসস্থান ছিল তিব্বত। গারোরা সাধারণত 'মান্দি' নামে নিজেদের পরিচয় দিতে পছন্দ করে। গারোরা মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর লোক।

সামাজিক জীবন : গারোদের সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। তাদের সমাজে মাতা হলেন পরিবারের প্রধান। সন্তানেরা মায়ের উপাধি ধারণ করে। পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ কন্যা পরিবারের সমুদয় সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে থাকে। গারো পরিবারে পিতা সংসার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে।

গারো সমাজের মূলে রয়েছে মাহারি বা মাতৃগোত্র পরিচয়। তাদের সামাজিক জীবনে বিশেষত বিয়ে, উত্তরাধিকার, সম্পত্তির ভোগ-দখল ইত্যাদিতে এই মাহারির গুরুত্ব অপরিসীম। মাতার বংশ ধরেই গারোদের চাৎচি (গোত্র) ও মাহারি (মাতৃগোত্র) নির্ণয় করা হয়। গারো সমাজে একই মাহারির পুরুষ ও মহিলার মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ। বর ও কনেকে ভিন্ন ভিন্ন মাহারির অন্তর্ভুক্ত হতে হয়।

গারো সমাজে বেশ কয়েকটি দল রয়েছে। এরকম প্রধান পাঁচটি দল হচ্ছে : সাংমা, মারাক, মোমিন, শিরা ও আরেং।

অর্থনৈতিক জীবন : বাংলাদেশের গারোরা সাধারণত কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। পূর্বে গারোরা জুম চাষে অভ্যস্থ ছিল। বর্তমানে সমতলের গারোদের মধ্যে জুম চাষের প্রচলন নেই। তারা হাল চাষের সাহায্যে প্রধানত ধান, নানা জাতের সবজি ও আনারস উৎপাদন করে।

ধর্মীয় জীবন : গারোদের আদি ধর্মের নাম ছিল 'সাংসারেক'। অতীতে গারোরা বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করত। তাদের প্রধান দেবতার নাম ছিল 'তাতারা রাবুগা'। গারোরা সালজং, সুসিমে, গোয়েরা, মীন প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা করত। নাচ-গান ও পশু বলিদানের মাধ্যমে তারা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করত। বর্তমানে গারোদের অধিকাংশ লোক খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী। তারা এখন বড়দিনসহ খ্রিষ্ট ধর্মীয় উৎসব পালন করে।

২০২০

সাংস্কৃতিক জীবন

গারো নারীদের নিজেদের তৈরি পোশাকের নাম 'দকমান্দা' ও 'দকশাড়ি'। পুরুষদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম 'গান্দো'।

ঐতিহ্যবাহী পোশাকে গারো নারী

গারোরা ভাতের সাথে মাছ ও শাকসবজি খেয়ে থাকে। তাদের একটি বিশেষ খাদ্য হচ্ছে কচি বাঁশের শুঁড়ি। এর জনপ্রিয় নাম 'মেওয়া'। এছাড়াও তারা কলাপাতা মোড়ানো পিঠা, মেরা পিঠা এবং তেলের পিঠা খেতে পছন্দ করে।

গারোরা খুব আমোদ-প্রমোদ প্রিয়। তাদের সামাজিক উৎসবগুলো কৃষিকেন্দ্রিক। তাদের প্রধান সামাজিক ও কৃষি উৎসব হলো 'ওয়ানগালা'।

গারোদের ওয়ানগালা উৎসব

বাংলাদেশের গারোদের ভাষা 'আচিক খুসিক'। এই ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা নেই। গারো ভাষা তিব্বতীয়-বর্মি ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

কাজ : গারোদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

জীবনব্যবস্থা	বৈশিষ্ট্য
সামাজিক	
অর্থনৈতিক	
সাংস্কৃতিক	
ধর্মীয়	

২০২০

পাঠ-৪ : সাঁওতাল

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে একটি প্রধান নৃগোষ্ঠী হলো সাঁওতাল। তারা রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া জেলায় বাস করে। ধারণা করা হয়, সাঁওতালদের পূর্বপুরুষরা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে বাংলাদেশের এসব অঞ্চলে আসে। আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারতীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গেও বেশ কিছু সাঁওতাল বসবাস করে।

সাঁওতালরা অস্ট্রালয়েড নৃগোষ্ঠীভুক্ত লোক। তাঁদের দেহের রং কালো, উচ্চতা মাঝারি ধরনের এবং চুল কালো ও ঈষৎ ঢেউ খেলানো।

সামাজিক জীবন : সাঁওতাল সমাজ হলো পিতৃসূত্রীয়। তাদের সমাজে পিতার সূত্র ধরে সন্তানের দল ও গোত্র পরিচয় নির্ণয় করা হয়। সাঁওতাল সমাজের মূল ভিত্তি হচ্ছে গ্রাম-পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত পরিচালনার জন্য সাধারণত পাঁচজন সদস্য থাকেন। এরা হলো মাঞ্জহি হারাম, জগমাঞ্জহি, জগপরানিক, গোডেৎ ও নায়কি। নায়কিকে তারা পঞ্চায়েত সদস্য নয় বরং ধর্মগুরু হিসাবে মনে করে।

অর্থনৈতিক জীবন : সাঁওতালদের প্রধান জীবিকা হলো কৃষি। বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় তারা মূলত কৃষি শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। নারী ও পুরুষ উভয়ই ক্ষেতে কাজ করে। তারা ধান, সরিষা, তামাক, মরিচ, তিল, ইক্ষু প্রভৃতি ফসলের চাষ করে। তাছাড়া বাঁশ, বেত, শালপাতা প্রভৃতি দ্বারা নানা প্রকার মাদুর, ঝাড়ু প্রভৃতি তৈরি করে নিজেদের প্রয়োজন মিটায় ও হাটে বিক্রি করে।

ধর্মীয় জীবন : সাঁওতাল নৃগোষ্ঠী প্রধানত দুইটি ধর্মের অনুসারী। তাদের এক অংশ সনাতন হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করে এবং এই ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। অপর অংশ খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং তারা খ্রিষ্ট ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে।

সাংস্কৃতিক জীবন : সাঁওতালদের প্রধান খাদ্য ভাত। সাধারণত সাঁওতালরা মাটির ঘরে বাস করে। তাদের বাড়ির দেয়াল মাটির তৈরি এবং তাতে খড়ের ছাউনি থাকে। সাঁওতালরা তাদের ঘর-বাড়ি খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে।

সাঁওতালদের নিজস্ব উৎসবাদির মধ্যে 'সোহরাই' এবং 'বাহা' উল্লেখযোগ্য। তাদের সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হলো 'ঝুমুর নাচ'। সাঁওতালদের বিবাহ অনুষ্ঠানে আয়োজিত হয় 'দোন' ও 'ঝিকা' নাচ।

সাঁওতাল মেয়েরা শাড়ি পরে। পুরুষরা লুঙ্গি পরে। সাঁওতালরা অলঙ্কারপ্রিয়। মেয়েরা হাতে ও গলায় পিতলের বা কাঁসার গহনা পরে। অনেক পুরুষ সাঁওতালও অলঙ্কার ব্যবহার করে। পুরুষদের কেউ কেউ গলায় মালা ও হাতে বালা পরে থাকে।

সাঁওতালদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক

সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষিতের হার খুব কম হলেও বর্তমানে সাঁওতাল পরিবারের ছেলে-মেয়েরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হচ্ছে। ১৮৫৫ সালে সংগঠিত সাঁওতাল বিদ্রোহ উপমহাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। এই বিদ্রোহের নায়ক দুই ভাই সিধু ও কানুকে সাঁওতালরা বীর হিসাবে ভক্তি করে।

কাজ : সাঁওতালদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

জীবনব্যবস্থা	বৈশিষ্ট্য
সামাজিক	
অর্থনৈতিক	
সাংস্কৃতিক	
ধর্মীয়	

পাঠ-৫ : মারমা

মারমা নারী

বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে জনসংখ্যার দিক থেকে মারমাদের অবস্থান দ্বিতীয়। মারমা নৃগোষ্ঠীর অধিকাংশই রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় বাস করে। 'মারমা' শব্দটি 'ম্রাইমা' শব্দ থেকে উদ্ভূত।

সামাজিক জীবন : পার্বত্য অঞ্চলে বোমাং সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত মারমা সমাজের প্রধান হলেন বোমাং চিফ বা বোমাং রাজা।

প্রত্যেক মৌজায় কতগুলো গ্রাম রয়েছে। গ্রামবাসী গ্রামের প্রধান মনোনীত করে। মারমারা গ্রামকে তাদের ভাষায় 'রোয়া' এবং গ্রামের প্রধানকে 'রোয়াজা' বলে।

মারমা পরিবারে পিতার স্থান সর্বোচ্চ হলেও পারিবারিক কাজকর্মে মাতা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। মারমা সমাজে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মেয়েদের মতামত বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

অর্থনৈতিক জীবন : মারমাদের জীবিকার প্রধান উপায় হচ্ছে কৃষি। তাদের চাষাবাদের প্রধান পদ্ধতিকে জুম বলা হয়।

২০২০

ধর্মীয় জীবন : মারমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তারা এ ধর্মেরই অনুষ্ঠানাদি উদযাপন করে। প্রায় প্রত্যেকটি মারমা গ্রামে বৌদ্ধবিহার 'কিয়াং' এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু 'ভান্তে'দের দেখা যায়। মারমারা বৈশাখী পূর্ণিমা, আশ্বিনী পূর্ণিমা, কার্তিকী পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা ইত্যাদি দিনগুলোতে বৌদ্ধমন্দিরে গিয়ে ফুল দিয়ে এবং প্রদীপ জ্বালিয়ে বুদ্ধের পূজা করে। কাপ্তাইয়ের অনতিদূরে চন্দ্রঘোনার কাছে কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত 'চিৎমরম বৌদ্ধবিহার' মারমাদের নির্মিত একটি খুবই সুন্দর বৌদ্ধমন্দির। প্রতি বছর বহু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সেখানে বুদ্ধ প্রণাম ও পূজা করতে যায়।

সাংস্কৃতিক জীবন : মারমাদের ঘরবাড়ি বাঁশ, কাঠ ও ছনের তৈরি যা কয়েকটি খুঁটির উপর মাটি থেকে ৬-৭ ফুট উপরে নির্মিত হয়।

মারমা পুরুষেরা মাথায় 'গবং' (পাগড়ি বিশেষ), গায়ে জামা ও লুঙ্গি পরে। নারীরা গায়ে যে ব্লাউজ পরে তার নাম 'আঙ্গি', এছাড়াও তারা 'থামি' পরে। কাপড় বোনার কাজে মারমা নারীরা দক্ষ। তাদের মধ্যে হস্তচালিত ও কোমর উভয় ধরনের তাঁতের ব্যবহার রয়েছে।

মারমারা পার্বত্য অঞ্চলের অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মতো ভাতের সাথে মাছ-মাংস ও নানা ধরনের শাকসবজি খায়।

মারমারা পুরাতন বর্ষকে বিদায় ও নববর্ষকে বরণ উপলক্ষে সাংগ্রাই উৎসব উদযাপন করে। এ সময় তারা 'পানিখেলা' বা 'জলোৎসব'-এ মেতে উঠে। এই উৎসবে পানিখেলার নির্দিষ্ট স্থানে নৌকা বা বড় পাত্রে পানি রাখা হয়। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে এই উৎসব বেশ আনন্দ-উদ্দীপনার সাথে উদযাপিত হয়ে থাকে।

পানিখেলা উৎসব

কাজ : মারমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।

জীবনব্যবস্থা	বৈশিষ্ট্য
সামাজিক	
অর্থনৈতিক	
সাংস্কৃতিক	
ধর্মীয়	

পাঠ -৬ : রাখাইন

বাংলাদেশের পটুয়াখালী, বরগুনা ও কক্সবাজার জেলায় রাখানইরা বাস করে। রাখাইনরা মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর লোক। তাদের মুখমণ্ডল গোলাকার, দেহের রং ফরসা ও চুলগুলো সোজা।

'রাখাইন' শব্দটির উৎপত্তি পালি ভাষার 'রাক্ষাইন' থেকে। এর অর্থ হচ্ছে রক্ষণশীল জাতি যারা নিজেদের পরিচয়, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় কৃষ্টিসমূহকে রক্ষা করতে সচেষ্ট।

বর্তমান মিয়ানমারের আরাকান অঞ্চল রাখাইনদের আদিবাস। রাখাইনরা এক সময় আরাকান থেকে এদেশে এসেছিল। তারা নিজেদের রাক্ষাইন নামে পরিচয় দিতে ভালোবাসে।

সামাজিক জীবন : রাখাইন পরিবার প্রধানত পিতৃতান্ত্রিক। পিতাই পরিবারের প্রধান। তবে মেয়েদেরকে তারা শ্রদ্ধা করে।

অর্থনৈতিক জীবন : রাখাইনরা প্রধানত কৃষির উপর নির্ভরশীল। তবে এর পাশাপাশি নিজস্ব হস্তচালিত তাঁত থেকে কাপড় বোনার কাজও তারা করে থাকে।

রাখাইনদের ঘরবাড়ি

ধর্মীয় জীবন : বাংলাদেশের রাখাইনরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। রাখাইন শিশু-কিশোরদের বৌদ্ধ মন্দিরে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হাতে ধর্মীয় শিষ্টাচারে দীক্ষিত করা হয়।

সাংস্কৃতিক জীবন : নদীর পাড় ও সমুদ্র উপকূলের সমতল ভূমিতে রাখাইনদের গ্রামগুলো অবস্থিত। রাখাইনরা মাচা পেতে ঘর তৈরি করে। তাদের কারও ঘর গোলপাতার ছাউনি, আবার কারও ঘর টিনের হয়ে থাকে।

রাখাইনরা নানা পালাপার্বণে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। এর মধ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিশেষ করে গৌতম বুদ্ধের জন্ম-বার্ষিকী, বৈশাখী পূর্ণিমা, বসন্ত উৎসব প্রধান। তবে চৈত্র-সংক্রান্তিতে রাখাইনরা যে সাংগ্রাই উৎসব পালন করে সেটাই তাদের সবচেয়ে বৃহৎ ও সর্বজনীন আনন্দ উৎসব।

রাখাইন পুরুষেরা লুঙ্গি ও ফতুয়া পরে। পুরুষরা সাধারণত ফতুয়ার উপর লুঙ্গি পরে। মন্দিরে প্রার্থনাকালীন এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ও লোকজ অনুষ্ঠানে তারা মাথায় পাগড়ি পরে। পাগড়ি তাদের ঐতিহ্যের প্রতীক। রাখাইন মেয়েরা লুঙ্গি পড়ে। লুঙ্গির উপরে ব্লাউজ পরে।

ঐতিহ্যবাহী পোশাকে রাখাইন

২০২০

কাজ : রাখাইনদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর :

জীবনব্যবস্থা	বৈশিষ্ট্য
সামাজিক	
অর্থনৈতিক	
সাংস্কৃতিক	
ধর্মীয়	

পাঠ-৭ : বাংলাদেশের চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, রাখাইন নৃগোষ্ঠীর সাথে বাঙালি নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ও আদান-প্রদান

বাংলাদেশের মানুষ প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছে এবং সেই সকল সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ করেছে। এক সংস্কৃতির সাথে অন্য সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের বিনিময়ের ফলে তৈরি হয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণ যা মানুষে-মানুষে সাংস্কৃতিক আন্তঃসম্পর্কের ভিত রচনা করে। এই আন্তঃসম্পর্ক যতটা ঘনিষ্ঠ এবং স্থায়ী হবে ততই বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে সুষম যোগাযোগ স্থাপিত হবে।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহ বহু কাল থেকে বাঙালিদের সাথে এই ভূখণ্ডে বসবাস করে আসছে। জীবনের প্রয়োজনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহ যেমন বাঙালিদের অনেক কার্যাবলি গ্রহণ করেছে তেমনি বাঙালিরাও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের সংস্কৃতির অনেক উপাদান গ্রহণ করেছে। ফলে সকলের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে যা বাংলাদেশকে একটি বহুসংস্কৃতির দেশ হিসাবে বিশ্বে তুলে ধরেছে।

ভাষা

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ কুড়ি, গণ্ডা, পণ, গোলমাল, হৈ-চৈ, আবোল-তাবোল, টা-টি, ঠন-ঠন, কন-কন, ভোঁ-ভোঁ প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শব্দভাণ্ডার থেকে এসেছে। এছাড়া লাঙল, জোয়াল, ঢেঁকি, কুলা, মই, দড়ি, কাস্তে, পাঁচনি, নিড়ানি, হাল, পাল, দাঁড়, লগি, বৈঠা, বাতা, মাছ ধরার উপকরণ- পলো, ডুলা, কোচ, চাঁই, বড়শি ইত্যাদি উপকরণগুলো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি থেকে এসেছে। ভাষাতত্ত্ববিদগণের গবেষণা থেকে জানা যায় যে, চাকমা ভাষা বাংলা, পালি,ওড়িয়া এবং অহমিয়া প্রভৃতি ভাষার শব্দের সাথে গভীরভাবে সর্ম্পকযুক্ত ও সাদৃশ্যপূর্ণ।

উৎসব

নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়ার জন্য পালিত পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের বৈসাবি বা বিজু আর বাঙালির পহেলা বৈশাখ আজ একই বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। নতুন ধান মাড়াইয়ে বাঙালির নবান্ন আর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ওয়ানগালা একই সূত্রে গ্রোথিত।

খেলাধুলায়

বাংলাদেশের বিভিন্ন খেলাধুলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষদের অংশ গ্রহণ চোখে পড়ার মতো। বাংলাদেশের জাতীয় মহিলা ফুটবল ও হকি দলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নারী খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাথে বাঙালিদের সংমিশ্রণ ও বিনিময়কেই তুলে ধরে।

অর্থনীতি

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষদের উৎপাদিত শস্য ও দ্রব্যাদি সারা দেশের মানুষের প্রয়োজন মিটাচ্ছে। খাসিয়াদের পান, খাসিয়া ও মণিপুরিদের কমলা, পাহাড়ের মসলা, উত্তরবঙ্গের ধান, গারোদের আনারস সবার চাহিদা পূরণের পাশাপাশি অবদান রাখছে জাতীয় অর্থনীতিতে। সিলেটের মণিপুরিদের উৎপাদিত মণিপুরি শাড়ি ও শাল আজ দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে যা আমাদের বৈদেশিক আয়ের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করছে।

সংস্কৃতিতে

বর্তমানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার এবং খাদ্যাভাসে বাঙালিদের পোশাক (শার্ট, প্যান্ট, থ্রিপিস), অলঙ্কার (ইমিটেশন) এবং খাদ্যাভ্যাস (ভাত, মাছ, কোমল পানীয়) ইত্যাদি নিজেদের জীবনে ধারণ করছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মণিপুরিদের নাচ সকলের নিকট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তাছাড়া সাঁওতালদের ঝুমুর নাচ, চাকমাদের বাঁশ নৃত্য, ত্রিপুরাদের বোতল নাচও সকলের নিকট জনপ্রিয়। এর ফলে একে অপরের মাঝে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের আদান প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের আন্তঃসম্পর্ক আরও দৃঢ় হচ্ছে।

রাজনৈতিক জীবনে

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে এদেশের নৃগোষ্ঠীদের অবদান অবিস্মরণীয়, যা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও বাঙালিদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ও আদান-প্রদানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মুক্তিযুদ্ধে চাকমা, মারমা, মং, রাখাইন, সাঁওতাল, ওঁরাও, মালপাহাড়ি, গারোসহ আরও অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং অনেকে শহিদও হয়েছেন।

এভাবে ভাষার ব্যবহার, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও বাঙালিরা একে অপরের সান্নিধ্যে এসে নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করেছে।

কাজ : বাংলাভাষায় প্রচলিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের শব্দভাণ্ডারের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের কোন নৃগোষ্ঠীর ভাষার নাম-'আচিক খুসিক'?

ক. চাকমা খ. গারো
গ. মারমা ঘ. সাঁওতাল

২. উনিশ শতকে উপমহাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা কোনটি?

ক. গারো বিদ্রোহ খ. রাখাইন বিদ্রোহ
গ. সাঁওতাল বিদ্রোহ ঘ. খাসিয়া বিদ্রোহ

৩. মারমা নৃগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

i. সমতল থেকে ৬/৭ ফুট উপরে বাড়ি তৈরি
ii. মাতৃপ্রধান পরিবার
iii. হস্তশিল্পে পারদর্শিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

বার্ষিক পরীক্ষা শেষে সুমাইয়া মা-বাবার সঙ্গে কক্সবাজার বেড়াতে যায়। এখানে বেড়াতে বের হয়ে সে দেখতে পেল এক বিশেষ নৃগোষ্ঠীর মানুষ মাচা পেতে ঘর তৈরি করে বাস করছে। তাদের মুখের আকৃতি গোল, দেহের রং ফরসা।

৪. সুমাইয়ার দেখা নৃগোষ্ঠীর নাম কী?

ক. চাকমা খ. সাঁওতাল
গ. মারমা ঘ. রাখাইন

২০২০

৫. **সুমাইয়ার দেখা নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-**

i. পরিবারের প্রধান হলেন বাবা

ii. প্রধান জীবিকা কৃষি

iii. ঘরবাড়ি বাঁশ ও ছনের তৈরি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. i ও ii

গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিরু পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি মেয়ে। বাংলাদেশের বাইরে অরুনাচলেও তাদের জনগোষ্ঠীর লোকদের বসবাস রয়েছে। নিরু তার বান্ধবী শুভ্রার সাথে ময়মনসিংহে তার গ্রামের বাড়ি বেড়াতে গেল। ফলে সে খুব কাছ থেকে শুভ্রাদের ধর্মীয় আচার আচরণ ও জীবিকা নির্বাহ দেখার সুযোগ পেল। সেখানে শুভ্রার পরিবারের সকল সদস্যরা শুভ্রার মায়ের মতামতকে প্রধান্য দিচ্ছে দেখে সে ভীষণ অবাক হলো।

ক. মারমাদের গ্রামের প্রধানকে কী বলা হয়?

খ. বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে কীভাবে সুষম যোগাযোগ স্থাপিত হয়?

গ. নিরুদের সাংস্কৃতিক জীবন ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'নিরু ও শুভ্রাদের সামাজিক জীবনের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে' –উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

২. মাথিন চাকমা, অন্তরা সাহা ও অরুন এই তিন জনে এক সাথে বসে রমনা বটমূলে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান দেখছিল। একটু পরেই তারা লক্ষ করল ছায়ানটের শিল্পীদের গান পরিবেশনের পর খাগড়াছড়ি থেকে আগত চারজন নৃত্য শিল্পী নৃত্য পরিবেশন করছে। তাদের পরনে ছিল- আঞ্জি ও থামি।

ক. চাকমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসব কী?

খ. 'মিউয়া' বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকের চারজন নৃত্য শিল্পী কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পরিচয় বহন করছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'বৈসাবি আর পহেলা বৈশাখ আজ একই বিন্দুতে মিলিত হয়েছে'- এই উক্তিটি উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২০২০

দ্বাদশ অধ্যায়

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া সব বস্তুকেই প্রাকৃতিক সম্পদ বলা হয়। মানুষ প্রকৃতি থেকেই এসব সম্পদ আহরণ করে। এর ফলে মানুষের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনের অগ্রগতি ঘটে। প্রাকৃতিক সম্পদ পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করলে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ যথা: বনজ, জলজ, কৃষিজ, খনিজ, মৎস্য ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারব;
- বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যের বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প যেমন- পাট, বস্ত্র, চিনি, সিমেন্ট, ঔষধ, গার্মেন্টস, চিংড়ি, চা, চামড়া, তুলা, তামাক ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এসব শিল্পের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারব;
- জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এগুলো সংরক্ষণে ভূমিকা পালন করব।

পাঠ-১ : বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ

প্রকৃতির মধ্যে নানা মূল্যবান সম্পদ রয়েছে। যেমন পানি, বায়ু, মাটি, গাছপালা, জীবজন্তু, ফসল, খনিজ দ্রব্য ইত্যাদি। এসব প্রাকৃতিক বস্তুকে মানুষ নিজেদের চাহিদা মতো রূপান্তরিত করে ও কাজে লাগায়।

নিচে আমরা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করব :

১. মাটি : মাটি বাংলাদেশের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। এদেশের সমতল ভূমি খুবই উর্বর। বেশির ভাগ এলাকায় বছরে তিনটি ফসল উৎপন্ন হয়। দেশের ১০ ভাগের এক ভাগ অঞ্চল পাহাড়ি এলাকা। পাহাড়ে প্রচুর প্রাণিজ, বনজ ও খনিজ সম্পদ রয়েছে।

২. নদ-নদী : বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এদেশে ছোট-বড় অনেক নদী আছে। নদীগুলো মালামাল পরিবহনের সহজ মাধ্যম। নদীর পানি-প্রবাহ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। এছাড়া বিপুল পরিমাণ মৎস্য সম্পদ রয়েছে আমাদের নদ-নদীতে।

৩. খনিজ সম্পদ : বাংলাদেশের মাটির নিচে রয়েছে নানা রকম মূল্যবান খনিজ সম্পদ। এগুলোর মধ্যে কয়লা, গ্যাস, চুনাপাথর, চিনামাটি, সিলিকা বালি উল্লেখযোগ্য।

৪. বনজ সম্পদ : বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ ২৪,৯৩৮ বর্গকিলোমিটার। দেশের মোট ভূ-ভাগের ১৬ ভাগ হচ্ছে বন। বনে রয়েছে মূল্যবান গাছপালা। এগুলো আমাদের ঘরবাড়ি ও আসবাব তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া বনে রয়েছে পাখি ও প্রাণিসম্পদ। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য বনের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের আরও বেশি অর্থাৎ ২৫% বনভূমি থাকা প্রয়োজন।

৫. মৎস্য সম্পদ : বাংলাদেশে অনেক নদ-নদী, খাল-বিল ও দেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর রয়েছে। এসব খাল-বিল, নদ-নদীতে রয়েছে প্রচুর মিঠা পানির মাছ। এছাড়া সামুদ্রিক মাছও আমাদের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করছে। মাছ ধরে বহু মানুষ জীবিকা অর্জন করে।

৬. প্রাণিসম্পদ : আমাদের প্রাণিসম্পদের মধ্যে রয়েছে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগি প্রভৃতি। এগুলো গৃহপালিত প্রাণী। এছাড়াও রয়েছে নানা প্রজাতির প্রচুর পাখি।

৭. সমুদ্রসম্পদ : বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চল জুড়ে বঙ্গোপসাগর। সাগর তীরে গড়ে উঠেছে চট্টগ্রাম, মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দর। সাগরের পানি থেকে আমরা লবণ উৎপন্ন করি। তাছাড়া সাগর থেকে আহরণ করি প্রচুর মাছ।

এগুলোই আমাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। যদিও জনসংখ্যার তুলনায় কোনো কোনো সম্পদ যথেষ্ট পরিমাণে নেই। তবে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এগুলো ব্যবহার করতে পারলে সীমিত সম্পদ দিয়েই দেশ সমৃদ্ধ হতে পারে।

কাজ : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের তালিকা তৈরি কর। এসব সম্পদ আমাদের জীবনকে কীভাবে সমৃদ্ধ করছে সে বিষয়ে একটি প্রতিবেদন লেখ।

পাঠ-২ : আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের ভূমিকা

বেঁচে থাকার জন্য মানুষ নানা রকম কাজ করে। এসব মানুষের অর্থনৈতিক কাজ। এই অর্থনৈতিক কাজের উপর ভিত্তি করেই সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠে।

প্রাচীনকালে মানুষ বন থেকে ফলমূল সংগ্রহ করত এবং পশু শিকার করে তার মাংস খেতো। তারপর তারা ফসল ফলাতে শেখে এবং কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা তৈরি করে। খাদ্য ও অন্যান্য পণ্য উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগকে কেন্দ্র করেই মানুষের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে মধ্যযুগ পর্যন্ত মানুষ যেসব সম্পদ ব্যবহার করেছে তার সবটাই ছিল প্রাকৃতিক। প্রাকৃতিক সম্পদকে রূপান্তর করে মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে তা ব্যবহার করেছে। আধুনিককালে মানুষ কয়লা, লোহা, পাথর, স্বর্ণ, রৌপ্য, গ্যাস ইত্যাদি খনিজ পদার্থ উত্তোলন করতে শিখেছে। তারা প্রকৃতির সম্পদকে আরও দক্ষতার সাথে ব্যবহার করছে। এর জন্য তৈরি করছে অনেক আধুনিক যন্ত্র। এভাবেই মানুষ নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে দ্রুত উন্নত করেছে।

বাংলাদেশের উন্নতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের ভূমিকা : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত। অন্যদিকে সম্পদের তুলনায় দেশের জনসংখ্যা অনেক বেশি। এজন্য যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করতে হবে।

উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি : আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। এদেশের মাটি খুব উর্বর। এই উর্বর মাটি যথাযথভাবে ব্যবহার করলে কৃষি উৎপাদন অনেক বেড়ে যাবে। অন্যদিকে শিল্পায়নও করতে হবে পরিকল্পিতভাবে। কৃষিকাজে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করলে উৎপাদন বাড়বে এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে গ্রামে। ফলে কাজের জন্য তখন আর গাঁয়ের লোক শহরের দিকে ছুটবে না।

সুষম খাদ্যের অভাব পূরণ : বর্তমানে গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি ও মৎস্য এই তিন ধরনের প্রাণিজ সম্পদেরই ব্যবহার বেড়েছে। এর ফলে সুষম খাদ্যের অভাব পূরণ হচ্ছে। অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ খামার সৃষ্টির ফলে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে।

সেচ সুবিধা প্রদান : নদী-খাল-বিল হাওরের পানি দিয়ে আমরা কৃষি জমিতে সেচ দিতে পারি। ফলে শুকনো মৌসুমেও কৃষি উৎপাদন অনেক বাড়ানো যায়।

শিল্পের উন্নয়ন ও ব্যবহার প্রসার : দেশের গ্যাস, কয়লা ও চুনাপাথর আমাদের জীবনযাত্রায় কাজে লাগছে। এভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার হচ্ছে এবং শিল্পের প্রসার ঘটছে।

বনজ সম্পদের ভূমিকা : বাড়িঘর তৈরি ও আসবাবপত্র নির্মাণের জন্য আমরা বনজ সম্পদ ব্যবহার করি। আবার প্রকৃতিতে তাপমাত্রা কমানোর জন্য বনজ সম্পদ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে। এজন্য পরিকল্পিতভাবে আমাদের বনজ সম্পদ আরও বাড়াতে হবে।

দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহার করলে দেশের কৃষি-শিল্প যেমন উন্নত হবে তেমনি মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

কাজ : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ কীভাবে আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাবে?

পাঠ- ৩ : বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য

জীববৈচিত্র্য : প্রকৃতির মধ্যে সব রকমের জীব যে নিয়মে বেঁচে থাকে তাকেই সংক্ষেপে জীববৈচিত্র্য বলা যায়। মানুষ, প্রাণী ও কীট-পতঙ্গসহ জীবজগৎ প্রকৃতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখেই বেঁচে থাকে। জলবায়ু ও তাপমাত্রার নানা পরিবর্তনের ফলে জীবজগতের বিভিন্ন প্রাণী ও তরুলতার জন্ম বা মৃত্যু ঘটে। লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর জলবায়ুতে যেসব প্রাণী বেঁচে ছিল তাপমাত্রা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাদের মধ্যে অনেক প্রাণীরই বিলুপ্তি ঘটেছে। প্রকৃতির মধ্যে সব প্রাণীর অস্তিত্ব, বংশবিস্তার ও বিবর্তন ভারসাম্যপূর্ণভাবে ঘটে চলেছে। প্রাণীরা একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। সবুজ গাছপালা বাতাসে যে অক্সিজেন ছড়িয়ে দিচ্ছে তা গ্রহণ করে প্রাণীরা বেঁচে থাকে। আবার প্রাণীদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন পায় গাছপালা। বনে বিভিন্ন প্রাণী একে অন্যকে শিকার করে বেঁচে থাকে। প্রাণীদের বংশবিস্তার ঘটে একই নিয়মে। ঘূর্ণিঝড়ে সুন্দরবনের প্রাণী ও গাছপালার ক্ষতি হয়, আবার প্রকৃতির নিয়মেই সুন্দরবন গাছপালা ও প্রাণীতে পূর্ণ হয়ে উঠে।

বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যের অবস্থা : বাংলাদেশে একসময় প্রচুর বনজঙ্গল, জীবজন্তু ও পশুপাখি ছিল। নিচু জলাভূমিতে ছিল প্রচুর জলচর প্রাণী । দেশের জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় জলাভূমি ভরাট করে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ও শহর নির্মিত হচ্ছে। জীববৈচিত্র্যের উপর যার খারাপ প্রভাব পড়ছে। ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট নির্মাণের ফলে পানি প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে। ফলে জলচর প্রাণী ও মাছের বংশবিস্তারে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে।

ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ও শহর-গঞ্জ গড়ে উঠার ফলে দেশে কৃষিজমির পরিমাণ কমে গেছে। যেখানে সেখানে শিল্প-কারখানা তৈরি হওয়ার ফলে কারখানার রাসায়নিক বর্জ্যে নষ্ট হচ্ছে জমির উর্বরতা। বেশি মানুষের জন্য বেশি খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করতে হচ্ছে। এর ফলে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে মাছ, পোকা-মাকড় ও পাখির বংশবিস্তার। তাতেও জীববৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে।

দেশের জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে গাছপালা, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য সম্পদের উপর চাপ পড়ছে। শহরে গ্যাস ও পানি সরবরাহ কমে গেছে। গ্রামাঞ্চলেও গাছপালা কমে যাওয়ায় সেখানেও তাপমাত্রা বেড়ে গেছে। জীববৈচিত্র্য নষ্ট হওয়ার পরিণতি আমাদের জন্য ভয়ঙ্কর হবে। এই বিপদ মোকাবিলায় এখনই আমাদের সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে।

জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য করণীয়সমূহ:

- জনসংখ্যা কমিয়ে আনতে হবে;
- কৃষি জমি নষ্ট করা যাবে না;
- কৃষি উৎপাদনে জীববৈচিত্র্য রক্ষার নীতি অনুসরণ করতে হবে;
- অপ্রয়োজনে সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা যাবে না;
- স্বাভাবিক পানি প্রবাহ বন্ধ করা যাবে না;
- জলাধার নির্মাণ ও সংরক্ষণ করতে হবে;
- রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে নিয়ম মেনে চলতে হবে;
- খনিজ সম্পদ ব্যবহারে প্রাকৃতিক নিয়ম মানতে হবে;
- বনজ সম্পদ বাড়াতে হবে এবং দেশে আরও বন সৃষ্টি করতে হবে;
- পশু ও মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও বৃদ্ধি করতে হবে;
- জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য সরকারি ও ব্যক্তি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা গ্রহণ করতে হবে;
- মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সর্বোচ্চ হুমকির মুখে রয়েছে।

কাজ : বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্যের বাস্তব অবস্থার চিত্র তুলে ধরে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

২০২০

পাঠ-৪ : বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প

বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত শিল্প। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (GDP) এ খাতের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশি ও বিদেশি উদ্যোক্তারা ইতোমধ্যে বাংলাদেশে বেশ কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনে যার ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। নিচে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্পের বিবরণ দেওয়া হলো:

পাট শিল্প : ১৯৫১ সালে নারায়ণগঞ্জে আদমজি পাটকল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পাট শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। এ দেশে একসময় প্রধান অর্থকরী ফসল ছিল পাট। পাট বিক্রি করে কৃষক তার পরিবারের টাকার চাহিদা পূরণ করত। একসময় পাটকলগুলো শুধু পাটের বস্তা উৎপাদন করত। এখন পাট দিয়ে নানা পণ্য-সামগ্রী উৎপাদনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, ভবিষ্যতে আরও হবে।

বস্ত্র শিল্প : ১৯৪৭ সালে এদেশে মাত্র ৮টি বস্ত্রকল ছিল। বর্তমানে ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর বস্ত্র ও সুতাকল রয়েছে। বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে কম মূলধন ও অধিক শ্রমিক ব্যবহার করে এ শিল্পের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। শিল্পায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে বস্ত্র শিল্পের প্রাধান্য ছিল।

পোশাক শিল্প : সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। গত শতকের আশির দশকে এ শিল্পের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। অতি অল্প সময়ে এ শিল্পটি দেশের বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্পে পরিণত হয়েছে। দেশে বর্তমানে প্রায় তিন হাজারেরও অধিক পোশাক শিল্প ইউনিট রয়েছে। এতে প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করছে। বাংলাদেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোতে পোশাক রপ্তানি করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে।

চিনি শিল্প : বাংলাদেশে প্রচুর আখের চাষ হয়। আখ থেকে চিনি ও গুড় তৈরি হয়। ১৯৩৩ সালে নাটোরের গোপালপুরে প্রথম চিনিকল প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে দেশে ১৭টি চিনিকল আছে। আমাদের চাহিদা অনুযায়ী চিনি দেশে উৎপাদিত হয় না। ফলে বাংলাদেশকে প্রতি বছর প্রচুর চিনি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

২০২০

কাগজ শিল্প : ১৯৫৩ সালে চন্দ্রঘোনায় কর্ণফুলী কাগজের কল স্থাপিত হওয়ার মধ্য দিয়ে এদেশে কাগজ শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। স্থানীয় বাঁশ ও বেতকে ব্যবহার করে কাগজ উৎপাদন শুরু হয়। দেশে এখন সরকারি ও বেসরকারিখাতে বেশ কয়েকটি কাগজের কল রয়েছে। সরকারি পর্যায়ে কর্ণফুলী, পাকশী, খুলনা হার্ডবোর্ড ও নিউজপ্রিন্ট মিল ছাড়াও বেসরকারি পর্যায়ে বসুন্ধরা ও মাগুরা পেপার মিল উল্লেখযোগ্য কাগজ শিল্প প্রতিষ্ঠান।

সার শিল্প : কৃষি প্রধান বাংলাদেশে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যেই রাসায়নিক সার তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৬১ সালে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে প্রথম প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক সার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশে এখন ৮টি সার কারখানা চালু আছে। বাংলাদেশের সারের চাহিদা পূরণের জন্যে এ কয়টি কারখানার উৎপাদন যথেষ্ট নয়। প্রতি বছর বিদেশ থেকে আমাদের প্রচুর সার আমদানি করতে হচ্ছে।

সিমেন্ট শিল্প : পাকা বাড়িঘর, দালান কোঠা তথা শহর নির্মাণে প্রচুর সিমেন্টের প্রয়োজন হয়। চুনাপাথর ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সমন্বয়ে সিমেন্ট উৎপাদিত হয়। ১৯৪০ সালে ছাতক সিমেন্ট কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে এদেশে সিমেন্ট শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে বড় ও মাঝারি আকারের ১২টি সিমেন্ট কারখানা রয়েছে। এসব কারখানায় দেশের মোট চাহিদার অর্ধেক সিমেন্ট উৎপাদিত হয়। বাকি সিমেন্ট আমাদের বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

ঔষধ শিল্প : বাংলাদেশে বর্তমানে ঔষধ একটি সম্ভাবনাময় শিল্প হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। এক সময় আমাদেরকে প্রচুর অর্থ খরচ করে বিদেশ থেকে ঔষধ আমদানি করতে হতো। এখন সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে বেশ কয়েকটি ঔষধ কোম্পানি তৈরি হয়েছে যারা দেশের ঔষধ চাহিদার অনেকটাই পূরণ করছে, একই সঙ্গে বিদেশে ঔষধ রপ্তানিও করছে। বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী শিল্প হিসাবে ঔষধের সম্ভাবনার কথা সকলেই এখন গুরুত্বের সঙ্গে ভাবছে।

চামড়া শিল্প : বাংলাদেশে প্রচুর গরু, ছাগল ও মহিষ পালন করা হয়। এদেশে বহু আগে থেকেই চামড়া বা টেনারি শিল্প গড়ে উঠেছে। জুতা ও ব্যাগ তৈরিতে চামড়া শিল্পের জুড়ি নেই। এখন বাংলাদেশে কিছুসংখ্যক চামড়া শিল্প কারখানা তৈরি হয়েছে যেগুলো দেশের গরু, ছাগল ও মহিষের

চামড়া থেকে জুতা, ব্যাগসহ নানা উন্নতমানের জিনিস তৈরি করছে। কোনো কোনো কোম্পানি বিদেশেও তাদের উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করছে।

চা শিল্প : চা বাংলাদেশের অতি পুরাতন শিল্পের মধ্যে একটি। সিলেট অঞ্চলে প্রচুর চা উৎপাদিত হয়। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং দিনাজপুর ও পঞ্চগড়ে বর্তমানে চায়ের চাষ হচ্ছে। চা পাতা প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে তা পানের উপযোগী করা হয়। বাংলাদেশ নিজেদের চায়ের চাহিদা পূরণ করে বিদেশেও রপ্তানি করে থাকে।

তুলা : তুলা বাংলাদেশে একটি নতুন অর্থকরী ফসল। বর্তমানে বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে তুলার চাষ শুরু হয়েছে। এদেশের জলবায়ু ও মৃত্তিকা তুলা চাষের উপযোগী। তবে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম বলে প্রয়োজনীয় তুলার বেশির ভাগই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

তামাক : বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই কিছু না কিছু তামাকের চাষ হয়। বাংলাদেশে শীতকালে তামাকের চাষ হয়। উত্তরবঙ্গ তামাক চাষের জন্য প্রসিদ্ধ হলেও বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামেও তামাক চাষ হচ্ছে। বাংলাদেশ তামাক উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়ায় প্রতিবছর বিদেশ থেকে প্রচুর তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য আমদানি করতে হয়।

চিংড়ি : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চিংড়ি মাছের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে বাংলাদেশে চিংড়ি অন্যতম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পণ্য। তাই চিংড়িকে বাংলাদেশের 'সাদা সোনা' বলা হয়।

এছাড়া বাংলাদেশে নানা ধরনের ছোট ও মাঝারি শিল্প রয়েছে। নতুন নতুন শিল্প-কারখানা তৈরি হচ্ছে। ঐসব কারখানা থেকে বিভিন্ন পণ্য-সামগ্রী তৈরি হচ্ছে যা আমাদের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কাজ : বাংলাদেশের শিল্পখাতের তালিকা প্রণয়ন করে এগুলোর গুরুত্ব চিহ্নিত কর।

পাঠ-৫ : বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্পের অবদান

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্প: বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় অত্যন্ত দ্রুত শিল্পায়ন ঘটছে। নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটিয়ে মানুষ বিভিন্ন ধরনের পণ্য-সামগ্রী তৈরি করছে। সেইসব পণ্য নিয়ে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছে, জীবন-জীবিকা নির্বাহ করছে। শিল্পের বিকাশে মানুষের উদ্যোগ, পুঁজি এবং গবেষণা ও অভিজ্ঞতাই প্রধান ভূমিকা পালন করে। এখন সকল রাষ্ট্রই দ্রুত শিল্পায়ন ঘটানোর জন্যে উদার নীতিমালা প্রণয়ন করছে। দেশি বিদেশি শিল্পোদ্যোক্তাদের নিজ দেশে পুঁজি বিনিয়োগ ও শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। এর ফলে অর্থনীতিতে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটছে। অর্থনৈতিক উন্নতিই দেশের জনগণের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সহায়তা করে। সে কারণে দ্রুত দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন বা উন্নতি ঘটাতে হলে শিল্প বিকাশের কোনো বিকল্প নেই। এমন কি কৃষি বা সেবা খাতেও উন্নতি করতে হলে শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে। সেইসব খাতও এখন যন্ত্রপ্রযুক্তির ব্যবহারে ব্যাপক উন্নতি লাভ করছে। ফলে কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থাও এখন শিল্পায়নের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে। শিল্প ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে এখন কৃষক অধিক ফসল ফলাচ্ছে, নিজের চাহিদাপূরণ করেও বাজারে ফসল বিক্রি করে নিজের অন্যান্য চাহিদা পূরণ করতে পারছে। ফলে সামাজিকভাবে কৃষকের জীবনযাত্রা এখন আগের চেয়ে অনেক নিরাপদ হয়ে উঠছে।

বাংলাদেশে শিল্প বিকাশের প্রভাব : বাংলাদেশে জনসংখ্যার চাপ অত্যন্ত বেশি। সব মানুষকে একমাত্র কৃষি স্বচ্ছলতা দিতে সক্ষম নয়। এ অবস্থায় কল-কারখানায় কাজ করে শ্রমজীবীদের পরিবারের দারিদ্র্য ঘুচানো সম্ভব হচ্ছে। অনেকে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে ভালো বেতনে চাকরি করছে। এভাবে কৃষির বাইরেও অসংখ্য মানুষের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশে একমাত্র গার্মেন্টস শিল্পের সঙ্গেই এখন প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষ জড়িত আছে। এদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক হলো নারী-যারা নিজেদের দারিদ্র্য ঘোচাতে গার্মেন্টসে যুক্ত হয়েছে। তারা স্বাবলম্বী মানুষ হিসাবে গড়ে উঠেছে। অনেকেই কাজের পাশাপাশি লেখাপড়া ও প্রশিক্ষণ নিয়ে অধিকতর দক্ষতা অর্জন করছে। নিজেদের সন্তানদের তারা লেখাপড়ার মাধ্যমে যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে।

শুধু গার্মেন্টসে নয়, অন্যান্য খাতেও গ্রাম থেকে আসা লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের জীবিকার সংস্থান করছে। এভাবে শিল্প ও প্রযুক্তির সংস্পর্শে এসে তারা যেমন একদিকে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে, অন্যদিকে সামাজিকভাবেও তারা নতুন আবাসন, শিক্ষা, চিকিৎসা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে। এতে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। শহরে অতি দরিদ্রের চেয়ে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষকতা, আইন-ব্যবসাসহ নতুন নতুন পেশায় মানুষ যুক্ত হচ্ছে। মানুষ এভাবে শিল্প ও

২০২০

প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে আর্থ-সামাজিক জীবনব্যবস্থা গড়ে তুলছে তাকে আমরা সংক্ষেপে আধুনিক জীবন ব্যবস্থা বলছি। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো শিল্পের উন্নতি ঘটিয়েই উন্নত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এখন শিল্প, তথ্য-প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের দ্রুত প্রসার ঘটিয়ে আমরাও উন্নত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

কাজ : শিল্প বিকাশের প্রভাবের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মংলা একটি–

ক. স্থল বন্দর　　খ. বিমান বন্দর
গ. নদী বন্দর　　ঘ. সমুদ্র বন্দর

২. গ্রামের লোক শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা হ্রাসের উপায় হচ্ছে–

i. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি
ii. কৃষিকাজে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার
iii. নতুন নতুন পেশার কর্মসংস্থান সৃষ্টি

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i　　খ. i ও ii
গ. i ও iii　　ঘ. ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

হাসান সাহেবের নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও-এ একটি বৃহৎ বাগান বাড়ি আছে। তাতে আম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ এবং মেহগনি, নিম, সেগুন, গজারিসহ নানা প্রজাতির গাছপালা আছে। তিনি মাঝে মাঝে সপরিবারে তার বাগান বাড়িতে বেড়াতে যান। তার ছোট ছেলে লিমন সব ঘুরে ঘুরে দেখে এবং গাছে আম কাঁঠাল দেখে আনন্দিত হয়। নানা প্রজাতির পাখির কিচিরমিচির শব্দ শুনে সে খুব আনন্দ পায়। সে বাসার তুলনায় এখানে অনেক বেশি ঠাণ্ডা অনুভব করে।

৩. হাসান সাহেবের বাগানটি কোন প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত ?

ক. বনজ সম্পদ　　খ. মৎস্য সম্পদ
গ. খনিজ সম্পদ　　ঘ. প্রাণিসম্পদ

২০২০

৪. আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে উক্ত সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে–

i. সুষম খাদ্যের অভাব পূরণ

ii. শিল্পের কাঁচামাল যোগান দেওয়া

iii. প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রতন তার বন্ধুদের নিয়ে ঘোড়াশালে একটি শিল্প কারখানা দেখতে এসেছে। সে এ শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার দেখতে পায়। একইসঙ্গে এ শিল্পের উৎপাদিত পণ্য দেশে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকার কথা জানতে পারে।

ক. কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পাট শিল্পের যাত্রা শুরু হয় ?

খ. বাংলাদেশের বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্পটি বর্ণনা কর।

গ. রতনের দেখা শিল্পটির পরিচয় ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'রতনের অভিজ্ঞতায় কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির সাথে শিল্পায়নের সম্পর্ক ফুটে উঠেছে'– এর যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

২. নাদিয়া তার বাবার সাথে ভোলা শহরের রাস্তা ধরে হাঁটছিল। হঠাৎ ভীড় দেখে কাছে গিয়ে দেখল একটি টিউবওয়েল চাপ দেয়ায় পানি পড়ছে এবং একটি ছেলে ম্যাচের কাঠিতে আগুন ধরিয়ে টিউবয়েলের কাছে ধরার সাথে সাথেই সেখানে আগুন জ্বলে উঠলো। নাদিয়া তার বাবার কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বললেন, মাটির নিচ থেকে এক ধরনের বায়বীয় পদার্থ পানির সাথে মিশেছে বলেই এ ঘটনা ঘটেছে। তিনি আরও বললেন, উক্ত বায়বীয় পদার্থটি গৃহস্থালি ও কলকারখানায় জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ক. বাংলাদেশের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ কোনটি ?

খ. খনিজ সম্পদের সাথে জীবিকা অর্জনের সম্পর্ক বর্ণনা কর।

গ. নাদিয়ার দেখা সম্পদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত সম্পদের প্রাচুর্যই আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক, এ বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দাও।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বাংলাদেশ এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা

পৃথিবী নামের আমাদের এ গ্রহটিতে রয়েছে মোট ১৯৫টি দেশ। দেশগুলো বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত। এগুলো রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম হলেও, আজকের দুনিয়ায় কোনো দেশের পক্ষেই অন্যের সহযোগিতা ছাড়া একা চলা সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এমন কি রাজনৈতিক দিক দিয়েও দেশগুলো একে অপরের উপর কমবেশি নির্ভরশীল। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও নিজেদের উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের পরস্পরের সহযোগিতা নিতে হয়। যেমন একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশের খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের একার পক্ষে এগুলোর সমাধান সম্ভব নয়। এজন্য অন্য দেশ ও সংস্থার সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। একইভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশেরও রয়েছে অনেক সমস্যা। সকলের সহযোগিতার মাধ্যমে এসব সমস্যার সমাধান ও একটি শান্তিময় বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে পৃথিবীতে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা। এরমধ্যে কতগুলো গড়ে উঠেছে নির্দিষ্ট অঞ্চলকে ঘিরে অর্থাৎ ঐ অঞ্চলের দেশগুলোকে নিয়ে। যেমন : সার্ক, আসিয়ান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আফ্রিকান ইউনিয়ন প্রভৃতি। আবার কতগুলোর বিস্তৃতি ঘটেছে বিশ্ব জুড়ে। যেমন : জাতিসংঘ, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, ওআইসি, ইউনেস্কো, ইউনিসেফ, ফাও, ইউএনএফপিএ, ন্যাটো, ইউএনডিপি, হু প্রভৃতি। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে আমরা অনেকগুলো আঞ্চলিক সংস্থা সম্পর্কে জেনেছি। অষ্টম শ্রেণিতে আমরা ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, ইউএনডিপি, ফাও, হু, ইউএনএফপিএ সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- বিশ্বে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা যেমন- ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, ইউএনডিপি, ফাও এবং ইউএনএফপি-এর গঠন, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারব;
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সম্পর্ক উন্নয়নে এসব সংস্থার ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারব;
- বিভিন্ন সংস্থায় বাংলাদেশের সংশ্লিষ্টতা বিশ্লেষণ করতে পারব;
- আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ-১ : ইউনিসেফ (UNICEF)

জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক জরুরি শিশু তহবিল বা United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) জাতিসংঘের একটি বিশেষ সংস্থা যা বিভিন্ন দেশের বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের শিশুদের সেবা প্রদান করে। মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও রোগ প্রতিরোধ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মৌলিক শিক্ষা, স্যানিটেশন ও নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের ত্রাণ সাহায্য প্রদানের লক্ষ্যে ইউনিসেফ ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫০ সালের পর থেকে এটি বিশ্বের স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের শিশুদের কল্যাণ ও উন্নয়নে কাজ করে আসছে। ইউনিসেফ এর সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক-এ অবস্থিত। ১৯৬৫ সালে ইউনিসেফ শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পায়। ১৯৫১ সালে ঢাকায় ইউনিসেফের অফিস প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৭৭ সাল থেকে ইউনিসেফ নিয়মিতভাবে এ দেশের মা ও শিশুর উন্নয়নে কাজ করছে।

কাজ : ইউনিসেফ তৃতীয় বিশ্বে কী কী নিয়ে কাজ করছে?

পাঠ-২ : ইউনেস্কো (UNESCO)

ইউনেস্কো জাতিসংঘের একটি সামাজিক সংস্থা, এ সংস্থার পুরো নাম United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) অর্থাৎ 'জাতিসংঘ শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা'। ১৯৪৬ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। বর্তমানে ১৯৫টি রাষ্ট্র ইউনেস্কোর সদস্য। ইউনেস্কোর প্রধান লক্ষ্য হলো শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। পৃথিবীর সব মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার, আইনের শাসন ও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে ইউনেস্কো কাজ করে যাচ্ছে। ইউনেস্কোর মূল কাজের ক্ষেত্র চারটি-শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও যোগাযোগ।

বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের ২৭ শে অক্টোবর ইউনেস্কোতে যোগ দেয়। ১৯৭৩ সালে সরকার 'বাংলাদেশ ইউনেস্কো কমিশন' গঠন করে। এ কমিশন বাংলাদেশে ইউনেস্কোর কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করে। ইউনেস্কো বাংলাদেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বিশেষ করে বয়স্কদের শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইউনেস্কোর উদ্যোগেই আমাদের ভাষা শহিদ দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে সারা বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এছাড়া বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সুন্দরবন ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (যেমন বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ ও নওগাঁর পাহাড়পুর বা সোমপুর বৌদ্ধবিহার) সংরক্ষণেও ইউনেস্কো সহায়তা করছে।

কাজ : বাংলাদেশে ইউনেস্কোর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম দেশকে এগিয়ে নিতে কী ভূমিকা পালন করছে মূল্যায়ন কর।

পাঠ-৩ : ইউএনডিপি (UNDP)

ইউএনডিপি ১৯৬৫ সালে গঠিত হয়। এর পুরো নাম United Nations Development Programme (UNDP)। এটি জাতিসংঘের বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন ও তদারকি করে থাকে। নিউইয়র্কে এর সদর দপ্তর অবস্থিত।

বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নে সহায়তা করা ইউএনডিপি-র প্রধান কাজ। এই প্রতিষ্ঠানটি প্রধানত ৬টি ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করে যথা : গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা; দারিদ্র্য দূরীকরণ; সংকট মোকাবিলা; পরিবেশ ও এনার্জি সংরক্ষণ; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং এইচআইভি (HIV) ও এইডস (AIDS)।

১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশের উন্নয়নে ইউএনডিপি সহায়তা করে আসছে। ইউএনডিপি বাংলাদেশ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ, গ্রামাঞ্চলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নারী উন্নয়ন, সুশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, পরিবেশের উন্নয়ন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহায্য ও সহযোগিতা করছে।

কাজ : বাংলাদেশের উন্নয়নে ইউএনডিপির ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

পাঠ-৪ : বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (FAO)

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা FAO এর পুরো নাম Food and Agriculture Organization। এটি ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪টি দেশ এর সদস্য। এর সদর দপ্তর ইতালির রাজধানী রোমে। সংস্থাটি সারা বিশ্বে ক্ষুধার বিরুদ্ধে কাজ করছে। ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে বিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জনগণের জীবনমান উন্নয়ন হচ্ছে ফাও-এর প্রধান লক্ষ্য।

বাংলাদেশ ফাও-এর একটি সদস্য রাষ্ট্র। ঢাকায় এর শাখা অফিস আছে। বাংলাদেশের খাদ্য ও কৃষির উন্নয়নে ফাও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশ খাদ্যে পুরোপুরি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। উপরন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রায়ই আমাদের দেশে খাদ্য সংকট দেখা দেয়। এই সমস্যার মোকাবিলায় একটি খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ফাও সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাহায্য দেয়। এছাড়াও ফাও খাদ্যদ্রব্য সরবরাহে সহায়তা ও কৃষির উন্নয়নে পরামর্শ দিয়ে থাকে। জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় সহায়তা করে। ঝড় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদে ও প্রান্তিক চাষিদের প্রযুক্তিগত সহায়তাও দেয় সংস্থাটি।

কাজ : বাংলাদেশে খাদ্য সমস্যা সমাধানে ফাও-এর ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

পাঠ-৫ : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO এর পুরো নাম World Health Organization। এটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় একটি সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে। ১৯৪৮ সালের ৭ই এপ্রিল এটি গঠিত হয়। সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। বিশ্বের সকল অংশের মানুষের জন্য সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত করাই সংস্থাটির লক্ষ্য।

বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশ থেকে সংক্রামক ব্যাধি দূর করতে সাহায্য করছে। শিশুদের ৬টি ঘাতক রোগ (হাম, ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, যক্ষ্মা, পোলিও, হুপিং কাশি প্রভৃতি) প্রতিরোধেও সংস্থাটি অবদান রাখছে। এছাড়া দেশ থেকে ম্যালেরিয়া দূরীকরণ, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি, মাতৃ ও শিশু মৃত্যু হার কমানোর জন্যও কাজ করছে সংস্থাটি। কলেরা ও ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অবদান উল্লেখযোগ্য।

কাজ : শিশুদের ছয়টি ঘাতক রোগের প্রতিরোধে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ভূমিকা বর্ণনা কর।

পাঠ-৬ : জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA)

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল UNFPA এর পুরো নাম United Nations Population Fund। এটি ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদর দপ্তর নিউইয়র্কে। বিশ্বের ১৪০টিরও বেশি দেশ ইউএনএফপিএ-র সদস্য। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে ইউএনএফপিএ তার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তাদের জনসংখ্যা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানই হচ্ছে ইউএনএফপিএ-এর মূল লক্ষ্য। এটি জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে দেশগুলোর জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করে।

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশ। এই অতিরিক্ত জনসংখ্যা বাংলাদেশের জন্য এক বিরাট সমস্যা। এ সমস্যা মোকাবিলায় ইউএনএফপিএ দীর্ঘদিন যাবত বাংলাদেশকে সহযোগিতা করছে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে এগিয়ে নেওয়া, নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি বিষয়েও ইউএনএফপিএ বাংলাদেশ সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা দিচ্ছে। ইউএনএফপিএ-র সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পপুলেশন সায়েন্স বিভাগ চালু হয়েছে। এ বিভাগটি বাংলাদেশ ও বিশ্বের জনসংখ্যা সম্পর্কিত জ্ঞানদানের পাশাপাশি এ বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

কাজ : বাংলাদেশের জনসংখ্যা মোকাবিলায় ইউএনএফপিএ-র অবদান মূল্যায়ন কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইউনেস্কোর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত ?

ক. জেনেভা   খ. নিউইয়র্ক

গ. হেগ   ঘ. প্যারিস

২. FAO এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

ক. জেনেভা   খ. নিউইয়র্ক

গ. রোম   ঘ. প্যারিস

৩. UNFPA কাজ করছে-

i. জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে

ii. পরিবার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে

iii. জনসংখ্যাকে স্বাবলম্বী করতে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i   খ. ii

গ. i ও ii   ঘ. i ও iii

৪. নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের ভেটো ক্ষমতা আছে বলে তারা–

i. যেকোনো দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে

ii. নিরাপত্তা পরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্ত বাতিল বা স্থগিত করতে পারে

iii. যে কোনো বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i   খ. ii

গ. i ও ii   ঘ. ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

হানিফ সাহেবের প্রতিবেশী শামীম সাহেবের শিশু সন্তানটি হামে আক্রান্ত হয়। তিনি শিশুটিকে দেখতে গিয়ে জানতে পারেন শামীম সাহেব তার শিশুকে টিকা দেন নি। হানিফ সাহেব তখন তাকে জানান যে, মারাত্মক ৬টি রোগের টিকা বিনামূল্যে শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য দেওয়া হয়। তিনি সময়মতো টিকা দেওয়ায় তার সন্তানদের এসব রোগ হয়নি।

৫. **হানিফ সাহেবের বাচ্চাদের সুস্থ থাকার মূলে যে সংস্থাটি কাজ করছে–**

ক. ইউনেস্কো খ. ইউনিসেফ

গ. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঘ. বিশ্ব খাদ্য সংস্থা

৬. **উক্ত সংস্থা কর্তৃক এই প্রকল্প গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য কী ?**

ক. বিশ্বের সকল মানুষের জন্য সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত করা।

খ. বিশ্বের গ্রামীণ ও দরিদ্র দেশগুলোকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেওয়া।

গ. তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা।

ঘ. উন্নত দেশ কর্তৃক দরিদ্র দেশকে স্বাস্থ্যগত সুবিধা দেওয়া।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সংস্থা-১: প্যারিসে সদর দপ্তর। বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ১৯৫ টি রাষ্ট্র।

সংস্থা-২ : ১৯৪৮ সালের ৭ই এপ্রিল গঠিত হয়। জেনেভা শহরে সদর দপ্তর অবস্থিত।

ক. UNFPA কীভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে ?

খ. বাংলাদেশে UNDP এর কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর।

গ. বাংলাদেশে সংস্থা-২ এর কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'সংস্থা-১' বাংলাদেশের ঐতিহ্য সংরক্ষণে ভূমিকা রাখে'-বিশ্লেষণ কর।

২. পিয়াল টিভিতে ন্যাশনাল জিওগ্রাফি চ্যানেলে বাংলায় অনুষ্ঠান সম্প্রচার দেখে বিস্মিত হয়। সে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে পরিণত হওয়ায় এই কার্যক্রম চলছে। একটি বিশেষ আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাভাষাকে এই মর্যাদাদানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তার স্কুলে ঐ সংস্থার সহযোগিতায় একটি বিজ্ঞান গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে। অতি সম্প্রতি একটি ইন্টারনেট ক্লাবও গঠন করা হয়েছে।

ক. **UNDP** এর প্রধান কাজ কী?

খ. বিশ্ব খাদ্য সংস্থা কেন গঠন করা হয়?

গ. পিয়ালের বিদ্যালয়ে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতা রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. পিয়ালের বিদ্যালয়ের কার্যাবলির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে উক্ত সংস্থার ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

২০২০

চতুর্দশ অধ্যায়
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বিশ্বের সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘ। সংস্থাটি এখন বিশ্বের ১৯৩টি দেশের প্রতিনিধিত্ব করে এবং আমাদের পৃথিবীকে শান্তিপূর্ণ রাখা ও সকলে মিলেমিশে কাজ করার প্রয়াসে নিবেদিত। জাতিসংঘের উদ্যোগে সম্মিলিত উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ ছিল ২০০০-২০১৫ মেয়াদে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জন। লক্ষ্যগুলোর মধ্যে ছিল- চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা থেকে মুক্তি, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা এনে নারীর ক্ষমতায়ন, শিশুমৃত্যু হার কমানো, মায়ের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ, টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এরই ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ ২০১৫ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ঘোষণা করে, যার ইংরেজি নাম হচ্ছে Sustainable Development Goals (এসডিজি)। টেকসই উন্নয়ন অভীস্ট (এসডিজি) অর্জন এখন আমাদের সময়ের দাবী। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভিত্তি ছিল এমডিজি অর্জন। বাংলাদেশ এমডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এখন এসডিজি অর্জনের জন্য কাজ করা যাচ্ছে। এসডিজি'র আরেক নাম 'আমাদের ধরিত্রীর রূপান্তর: টেকসই উন্নয়ন ২০৩০ এজেন্ডা'। এর মধ্যে ১৭টি অভীষ্ট রয়েছে। পাঠ-১ এ এসডিজি'র বৃত্তলেখ চিত্র থেকে এই অভীষ্টসমূহ জানতে পারবে। আমরা সপ্তম শ্রেণিতে এসডিজি'র উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র সম্পর্কে জেনেছি। এ অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে টেকসই উন্নয়নের গুরুত্ব ও এসডিজি অর্জনে আমাদের করণীয় সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারব;
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টগুলোকে ভিত্তি করে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে টেকসই উন্নয়নের প্রবাহ চিত্র অঙ্কন করতে পারব;
- জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ-১: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়নের গুরুত্ব

পূর্ববর্তী শ্রেণিসমূহে আমরা জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) সম্বন্ধে জেনেছি। এসডিজির মূল উদ্দেশ্য হলো বিশ্বের সকল দেশ থেকে দারিদ্র্য নির্মূল করে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন ও ভারসাম্য আনয়ন। জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত দেশগুলো একটি সুখী ও সমৃদ্ধ পৃথিবী গড়ার প্রত্যয় নিয়ে টেকসই উন্নয়নের ১৭টি অভীষ্ট, ১৬৯ টি লক্ষ্যমাত্রা এবং ২৩০টি নির্ধারক স্থির করেছে। মূলত ২০১৬ সাল থেকে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো তাদের নিজ নিজ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার

আলোকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে কাজ শুরু করেছে। বাংলাদেশও এ কার্যক্রম থেকে পিছিয়ে নেই। খুব গুরুত্বের সাথেই বাংলাদেশ এ অংশীদারিত্বের দায়িত্ব নিয়েছে।

আমাদের দেশ ইতোমধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এমডিজি অর্জনে সক্ষমতা দেখিয়ে বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ ও মধ্যম-আয়ের দেশে পৌঁছাতে হলে এসডিজি অর্জন করতে হবে। কোনো অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনই হলো উন্নয়ন, কিন্তু এই উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলাফল যদি ভয়াবহ হয় তাহলে তাকে টেকসই উন্নয়ন বলা যায় না। টেকসই উন্নয়ন হলো একটি সামগ্রিক ধারণা যেখানে মানুষের চাহিদা পূরণ করতে প্রাকৃতিক সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহৃত হবে, তবে নিঃশেষ হয়ে যাবে না বা ক্ষতি হবে না। উন্নয়নের ফলাফল বিবেচনা করে ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমনের জন্য আগে থেকেই প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

যেমন- উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ক্ষুধা মুক্ত করতে অধিক ফসল ফলানো যেমন জরুরি, তেমনি অধিক ফসল ফলাতে অপরিমিত কীটনাশক-এর ব্যবহার স্বাস্থ্য, পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এক্ষেত্রে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনলেও তাকে টেকসই কৃষি উন্নয়ন বলা যাবে না। তাই খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর কথা ভাবতে গিয়ে কীটনাশকের ব্যবহার সহনশীল ও পরিমিত পর্যায়ের হতে হবে। সবার জন্য টেকসই ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমাদের এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক অসমতা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়। দ্রুত নগরায়ণ প্রক্রিয়ার সাথে সাথে পরিবেশবান্ধব নগরজীবন গড়ে তুলতে হবে।

আমরা সবেমাত্র উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হতে যাচ্ছি। এর জনসংখ্যার তুলনায় আয়তন সীমিত। সীমিত আয়তনে বিপুল জনসংখ্যার ভার বহন করতে অপরিকল্পিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এতে জীবন ও পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশ যদি এসডিজি অর্জন করতে সক্ষম হয় তাহলে যে সুফলগুলো আসবে তা হলো-

- সকল পর্যায়ে দরিদ্রতার অবসান হলে সমাজে ধনী-দরিদ্র বৈষম্য কমে আসবে। রাষ্ট্র জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা বিধান করতে পারবে।
- টেকসই কৃষি ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলে আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ হবে এবং আমরা কর্মঠ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হব। ক্ষুধামুক্ত হয়ে দক্ষ ও সমর্থ জনশক্তিতে পরিণত হব।
- গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত হলে সকলে সচেতন হবে এবং এই সচেতনতা এদেশের নাগরিকদের বহুমুখী সমস্যার সমাধানে ভূমিকা রাখবে।
- টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে জেন্ডার সমতা বিধান, সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, জ্বালানি সংকট নিরসনে নবতর উদ্ভাবন, কর্মসংস্থানের সমতা ও সুযোগ সৃষ্টি নিশ্চিত হবে। এর ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভারসাম্য আসবে।
- অবকাঠামো বিনির্মাণ, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে সমকক্ষতা অর্জন সহজ হবে। বিশেষ করে জীব-জগতের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা এবং প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র্য অক্ষুণ্ন থাকবে।
- কাঙ্ক্ষিত নগরায়ণ, উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সুশাসন, বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব এবং সহযোগিতা প্রভৃতি বিষয়গুলো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অগ্রাধিকার পাবে, পাশাপাশি নাগরিকদের বহুমুখী সমস্যা সমাধানে সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজ করা সহজ হবে।

উপরে বর্ণিত সুফলগুলো প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়ন করছে। আর এতে জাতিসংঘের উন্নয়ন সংস্থাগুলো সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে।

কাজ-১: টেকসই উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা পোস্টারে উপস্থাপন কর।

কাজ-২: 'এসডিজি অর্জনের মাধ্যমেই কেবল বাংলাদেশ মধ্যম-আয়ের দেশে পরিণত হবে'-এই শিরোনামে শ্রেণিতে একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন কর।

পাঠ-২: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে করণীয়

২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন করতে হলে আমাদের করণীয় কিন্তু কম নয়। আমাদের পরিবেশের অবয়ব মূলত দুইটি। একটি হলো প্রাকৃতিক, অপরটি সামাজিক। প্রাকৃতিক অবয়বই প্রাকৃতিক পরিবেশকে নির্দেশ করে। এর মূল উপাদান হলো- মাটি, পানি, গাছপালা, জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী ইত্যাদি। আর সামাজিক অবয়ব সামাজিক পরিবেশকে নির্দেশ করে। এর উপাদান হলো- আমাদের ধর্ম, বর্ণ, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদি যা আমাদেরকে অন্য সমাজ থেকে আলাদা করতে পারে। এজন্য আমাদের উভয় পরিবেশের উন্নয়ন ও সংরক্ষণে কাজ করতে হবে। এমনভাবে কাজ করতে হবে যেন বিদ্যমান অবস্থাকে সাথে নিয়েই আমাদের উন্নত অবস্থা গড়ে তোলা যায়।

টেকসই উন্নয়নের প্রধান তিনটি ক্ষেত্র হলো- ১. আমাদের পরিবেশ ২. অর্থনীতি ৩. সমাজ। আমরা যদি এ তিনটি ক্ষেত্রকে সবসময় বিবেচনায় রেখে কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করি তাহলে সেটি হবে টেকসই উন্নয়ন। তাই টেকসই উন্নয়নের তিনটি ক্ষেত্র নিয়েই আমাদের ভাবতে হবে।

টেকসই উন্নয়নের প্রধান তিনটি ক্ষেত্র

আমরা যদি আমাদের পরিবেশ নিয়ে ভাবি তাহলে প্রথমে আমাদের চিন্তা করতে হবে জলবায়ু নিয়ে। জলবায়ু সম্পর্কে আমরা সপ্তম শ্রেণিতে পড়েছি। বিশ্বের দিকে তাকালেই বুঝতে পারি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কী কী হচ্ছে। বাংলাদেশের জলবায়ুর উপর অনুকূল ও প্রতিকূল-দুরকম আবহাওয়ারই প্রভাব লক্ষ করা যায়। অনুকূল আবহাওয়ার কারণে এদেশের মাটি ফসল উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী। আবার অনেক সময় প্রতিকূল আবহাওয়া এদেশের জনজীবনকে বিপন্ন করে; যেমন- ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা, কালবৈশাখি, টর্নেডো, অতিবৃষ্টি, শৈত্যপ্রবাহ প্রভৃতি। এসব দুর্যোগ মোকাবিলা করে আমাদের বেঁচে থাকতে হয়। মানুষের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন, ক্রমাগত প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়ন, ভোগ-বিলাসিতাসহ সভ্যতার অগ্রগতির কারণে জলবায়ু তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হারাচ্ছে। এতে পৃথিবীর উষ্ণতা বেড়ে চলেছে এবং গ্রিন হাউজ প্রভাব আমাদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। শুধু তা-ই নয় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। মানুষ ও প্রাণিকুল ক্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়ছে। এ অবস্থা ঠেকাতে আমাদের পরিবেশ সংরক্ষণের টেকসই প্রযুক্তি খুঁজতে হবে।এজন্য প্রকৃতিকে ধ্বংস করে নয়, বরং তার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের অন্যতম উৎস বনভূমি। দ্রুত নগরায়ণ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এই বিপুল জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে বাড়িঘর নির্মাণ, আসবাবপত্র ও জ্বালানির সংস্থানে বন উজাড় করা হচ্ছে। গাছ আমাদের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করে মানবসমাজকে রক্ষা করে। মানুষের নিঃসৃত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গাছ গ্রহণ করে প্রাণী ও উদ্ভিদকুলের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে। এ কারণে আমাদের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির স্বার্থে গাছকাটার পাশাপাশি বনায়ন অব্যাহত রাখতে হবে।

টেকসই শহর ও সমাজের কথা চিন্তা করলে আমরা কী দেখতে পাই? শহরে বড় বড় দালান কোঠা, প্রয়োজনীয় শিল্প কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এগুলো গড়ে উঠলেই তাকে টেকসই শহর বলা যাবে না। সেখানে সুপরিকল্পিত বনভূমি, সুপেয় পানি, পরিচ্ছন্ন জলাশয়, উন্মুক্ত খেলার মাঠ, পার্ক, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ইত্যাদি গড়ে তুলতে হবে।

শহরের সমাজব্যবস্থা গ্রামের থেকে ভিন্ন। এখানে মানুষ বিভিন্ন কাজে সারাদিন ব্যস্ত থাকেন। তাই টেকসই শহরে শিশুদের দেখাশুনার জন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র এবং প্রবীণদের সেবাযত্নের জন্য প্রবীণ কল্যাণ কেন্দ্র গড়ে তোলা প্রয়োজন।

কাজ-১: পরিবেশবান্ধব শহর গড়ে তুলতে হলে আমাদের করণীয় চিহ্নিত কর।

কাজ-২: টেকসই উন্নয়নে আমাদের করণীয় দিকসমূহ তুলে ধরে একটি পোস্টার তৈরি করে উপস্থাপন কর।

কাজ-৩: টেকসই শহর ও সমাজ টেকসই উন্নয়নের কোন উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত আলোচনা করে বের কর।

আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য বজায়ে জলজ ও স্থলজ প্রাণী সংরক্ষণের উপর জোর দিতে হবে। আমাদের রয়েছে বিশাল বঙ্গোপসাগর। এতে নানা ধরনের জলজ প্রাণী বসবাস করে। এরা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে। জলজ সম্পদের প্রধান উৎস হচ্ছে মৎস্যসম্পদ। আমাদের দেশের অনেক ধরনের মাছের প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এ কারণে মৎস্যসম্পদ বাড়ানোর জন্য এমন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে যেন আমাদের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি তারা বিলুপ্ত হয়ে না যায়। অন্যদিকে বনজ ও গৃহপালিত পশু-পাখি স্থলজ প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। আমরা যদি এদেরকে ক্রমাগত নিধন করি, এদের বংশ বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের কথা না ভাবি, তাহলে পৃথিবী থেকে একদিন এসকল প্রাণী হারিয়ে যাবে। আমাদের নিজেদের প্রয়োজনেই এদেরকে রক্ষা করতে হবে। আমাদের বিশাল ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবনের প্রধান আকর্ষণ রয়েল বেঙ্গল টাইগার। ক্রমাগত বাঘ নিধনের ফলে সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এটি একটি বিপজ্জনক সংকেত।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি অপরিহার্য। জীবাশ্মজাত জ্বালানি পরিবেশের অনেক ক্ষতি করে। এক্ষেত্রে কয়লা ও তেল এর ব্যবহার উল্লেখ করা যায়। এগুলোর ব্যাপক ব্যবহারের ফলে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে জলবায়ু পরিবর্তন ও জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তির সম্মুখীন হচ্ছে। এজন্য আমাদের টেকসই জ্বালানি কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। টেকসই জ্বালানি কর্মসূচি গ্রহণ করলে অন্যান্য অভীষ্টগুলোও অর্জিত হবে ; জলবায়ু, শহর ও সমাজ এবং জলজ ও স্থলজ প্রাণী রক্ষা পাবে। সাশ্রয়ী মূল্যে দূষণমুক্ত জ্বালানি প্রাপ্তিতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে টেকসই উন্নয়নের একটি প্রবাহ চিত্র নিম্নে দেওয়া হলোঃ

গোবর/কচুরিপানা/গৃহস্থালির জলীয়জাত আবর্জনা → কম্পোস্ট সার → উপজাত হিসেবে বায়োগ্যাস → জ্বালানি হিসেবে রান্নার কাজে ব্যবহার

এইভাবে আমরা সূর্য থেকেও নবায়নযোগ্য সৌর জ্বালানি তৈরি করতে পারি, যা পরিবেশের কোনো ক্ষতি করে না।

কাজঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে টেকসই উন্নয়নের একটি নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রবাহ চিত্র অংকন কর।

এবার আমরা অর্থনৈতিক বিবেচনা প্রসঙ্গে আলোচনা করব। অর্থনৈতিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে যেতে হলে আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটি হলো সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান করা। উৎপাদন ও

ভোগের মধ্যে সমতা ফিরিয়ে আনা এবং যথাযথ বণ্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। পাশাপাশি দায়িত্বশীল ভোক্তা তৈরি ও উৎপাদন কৌশল বাস্তবায়ন করা। আর এজন্য উপযুক্ত কাজের পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কাজ করে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

কাজঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে টেকসই উন্নয়নের একটি দারিদ্র্য নির্মূলকরণ প্রবাহচিত্র অংকন কর।

টেকসই উন্নয়ন হলো এমন এক কর্মধারা যেখানে উন্নয়নের সাথে সাথে এর নেতিবাচক দিকগুলো প্রশমনে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। পরিবেশ, অর্থনীতি ও সমাজ সংশিষ্ট চিহ্নিত বিষয়গুলোর প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া, যেমন জেন্ডার সমস্যা বর্তমানে একটি বহুল আলোচিত বিষয়। আমরা জানি, আমাদের সমাজে ক্ষমতা ও যোগ্যতায় নারীরা এখনও বেশ পিছিয়ে রয়েছে। এ পিছিয়ে পড়া তার প্রকৃতিগত অযোগ্যতা নয়। এটি শুধু পরিস্থিতিগত অযোগ্যতা। কারণ শারীরিকভাবে নারী ও পুরুষ আলাদা বৈশিষ্ট্যের হলেও সামাজিকভাবে তাদের ক্ষমতা ও যোগ্যতা পুরুষের সমান হতে পারে। এজন্য তাদেরকে অধিক সুযোগ দিয়ে সমতা বিধান করতে হবে। নারীদেরকে যদি যথাযথ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চলাচল, মতপ্রকাশের সুযোগ-সুবিধা দিতে পারি তাহলে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। টেকসই উন্নয়ন ভাবনায় এ বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। শুধু নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করে নিজের দেশের কথা ভাবলেই হবে না, অন্যান্য উন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের সাথে তুলনা করে অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থানে যেতে লক্ষ্যও স্থির করতে হবে। এতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক অসমতা কমে আসবে।

সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে যাতে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। জনগণ যাতে সুবিচার থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্য দেশের সর্বত্র ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে হবে। বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকতর শক্তিশালী করতে হবে। প্রতিনিয়ত প্রতিষ্ঠানসমূহের দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করতে হবে এবং সে দুর্বলতাসমূহ দূরীকরণে প্রয়োজনীয় বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

কাজঃ সামাজিক বিবেচনায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে টেকসই উন্নয়নের একটি প্রবাহ চিত্র অংকন কর।

আমাদের উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের গুরুত্বপূর্ণ ৫টি উপাদানকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করার কথা বলছেন। এগুলো হলো- জনগণ, ধরিত্রী, সমৃদ্ধি, শান্তি ও অংশীদারিত্ব।

আমরা সবাই বিশ্বের সকল ভালো-মন্দ ও উন্নয়নের অংশীদার। বিশ্বের সব ধরনের উন্নয়ন, শান্তি স্থাপন, নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে।

এসডিজি বাস্তবায়ন করতে হলে সবার অংশগ্রহণ অর্থাৎ ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, সাধারণ নাগরিক, ছেলে-মেয়ে সবাইকে উৎসাহিত করতে হবে। এভাবে বিশ্বের সকলের অংশগ্রহণে আমরা পাব একটি উন্নত (অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, পরিবেশগত) পৃথিবী, যা সুন্দর বর্তমানকে টেকসই, সুন্দরতম, নিরাপদ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

২০২০

২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশ যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তা একটি ধারণা মানচিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো-

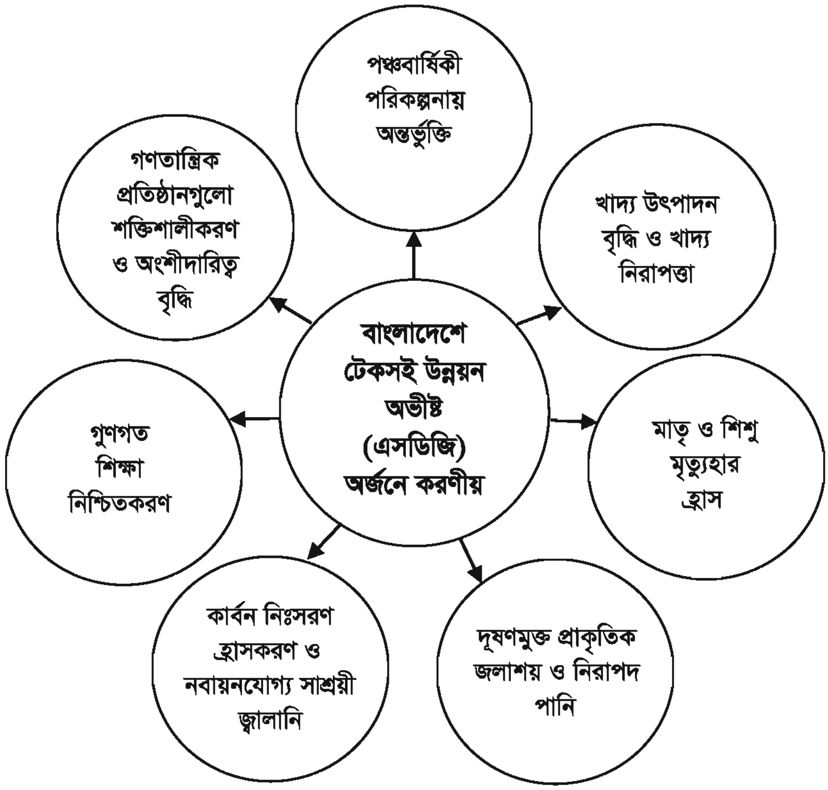

টেকসই উন্নয়নে বাংলাদেশের করণীয়

আমরা এসডিজি অর্জনে কী কী করতে পারি তা জানতে পেরেছি। এখন এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে আমরা দেশকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব।

বাড়ির কাজ: বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে টেকসই উন্নয়নের গুরুত্বের উপর ২০০ শব্দের একটি প্রতিবেদন লেখ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আয়ের দিক দিয়ে বাংলাদেশ এখন কোন পর্যায়ের দেশ?

ক. মধ্যম খ. নিম্ন-মধ্যম

গ. উচ্চ ঘ. নিম্ন

২. অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে-

i. বন উজাড় হচ্ছে

ii. পরিকল্পিত নগর গড়ে উঠছে

iii. সামাজিক অস্থিতিশীলতা দেখা দিচ্ছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের চিত্রটি পর্যবেক্ষণ করে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও-

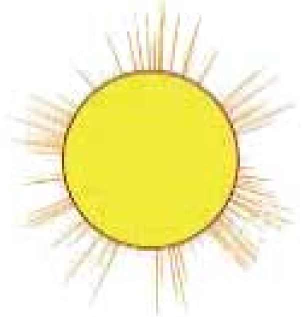

A

B

৩. 'A' চিহ্নিত বস্তুটি থেকে কোন ধরনের জ্বালানি তৈরি করা যায়?

ক. অনবায়নযোগ্য খ. নবায়নযোগ্য

গ. দূষণযুক্ত ঘ. জীবাশ্মযুক্ত

৪. **'B' চিহ্নিত প্রযুক্তির তৈরি জ্বালানির ফলে-**

i. পরিবেশের ক্ষতি হয়
ii. বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হ্রাস পায়
iii. অর্থনৈতিক অগ্রগতি বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii	খ. i ও iii
গ. ii ও iii	ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

রায়হান বসে বসে তার স্কুল জীবনের কথা ভাবছে। সেই সময়ের বাড়ির পাশের ছোট ছোট পাহাড় ও টিলা, সবুজ গাছপালা, প্রায় প্রতিটি বাড়িতে একাধিক পুকুর, ডোবা, খালবিল ইত্যাদি কতই না চমৎকার ছিল! আবার, তখনকার দিনে গ্রামের শিশুদের চিকিৎসা ও অপুষ্টির অভাবে মারা যাওয়ার দৃশ্য ভেবে কষ্টও হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে যখন সে গ্রামে যায় তখন দেখে সেখানে গাছপালা কেটে, পুকুর ডোবা ভরাট করে মার্কেট, ভবন তৈরি করা হয়েছে। এসব দেখে তার কাছে মনে হয়, নিঃশ্বাস নেওয়ার জায়গা বুঝি দিন দিন সংকুচিত হয়ে আসছে।

ক. নবায়নযোগ্য জ্বালানি কী?
খ. দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পাহাড়, নদী, খালবিল পরিবেশের কোন অবয়বের অন্তর্গত এবং কেন তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. রায়হানের মতো সবার প্রকৃত অর্থেই নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য কী করণীয় আছে বলে তুমি মনে কর?

সমাপ্ত

২০২০

শিক্ষাবর্ষ

দাখিল

৮ম-বা বি

শিক্ষাই দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারে

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিশ্রম উন্নতির চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন
নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য